নোনাজলের মাছ চাষে সাম্প্রতিক অগ্রগতি : মৎস্য চাষীদের জন্য পুস্তিকা

সম্পাদনা

ড. দেবাশীষ দে

ড. সঞ্জয় দাস

শ্রীমতী মৌমিতা আশ

www.icar.ciba.gov.in

নোনাজলের মাছ চাষে সাম্প্রতিক অগ্রগতি : মৎস্য চাষীদের জন্য পুস্তিকা

সম্পাদনা

ড. দেবাশীষ দে

ড. সঞ্জয় দাস

শ্রীমতী মৌমিতা আশ

কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৪৩৩৪৭

Adopted from:

M. Kumaran, K. P. Kumaraguru Vasagam and Kuldeep Kumar Lal, 2023.
The Advances in Brackishwater Aquaculture - A Handbook for Aquafarmers
ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai, 113p.

© ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai

Published by

Dr. Kuldeep Kumar Lal
Director
ICAR-Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai
75, Santhome High Road, MRC Nagar, R. A. Puram
Chennai - 600028, India

Citation:

Debasis De, Sanjoy Das, Moumita Ash, 2024.
Nonajaler Mach Chase Sampratik Agragati : Matsya Chashider Jannya Pustika
Kakdwip Research Centre of ICAR-CIBA, Kakdwip, 121p.

ISBN : 978-81-966350-9-1

মুখবন্ধ

নোনা জলে মাছ চাষের খামার, যেখানে চিংড়ি, মাছ, কাঁকড়া, এমনকি সামুদ্রিক শৈবাল ও আমাদের খাবারের জোগান দিতে বড় ভূমিকা রাখে। শুধু সুস্বাদু খাবারের জন্য নয়, পুষ্টির জোগান, কর্মসংস্থান, সমাজের উন্নয়ন, এমনকি দেশের অর্থনীতির গতি সচল রাখতেও নোনা জলের মাছ চাষের ভূমিকা অপরিসীম। এই ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ সবার চেনা নাম। সমুদ্র লাগোয়া প্রায় ১.৭০ লক্ষ হেক্টর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই চাষ, যার উৎপাদন প্রায় ৯.০ লক্ষ টন। তবে সব কিছুর মতো চিংড়ি চাষও অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। রোগ, বীজের সমস্যা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, এবং অনেক সময় কম দাম - এসব মিলে চিংড়ি চাষীদের পথ ঘিরে ধরে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ।তবে হাল ছাড়ার পাত্র নয় আমাদের চাষিরা। তাদের সাথে আছেন বিজ্ঞানী, গবেষক, এবং নীতিনির্ধারকরা। নতুন নতুন প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, এবং সরকারি সহায়তার মাধ্যমে তারা চেষ্টা করছেন চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর।এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ব্র্যাকিশওয়াটার একোয়াকালচার নামক কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।চাষ পদ্ধতি, স্বল্প মূল্যের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ, স্মার্ট চাষ - সব ক্ষেত্রেই তারা গবেষণা করে চাষীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন নতুন নতুন সমাধান। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা হাজির হয়েছি ‘নোনাজলের মাছ চাষে সাম্প্রতিক অগ্রগতি: মৎস্য চাষীদের জন্য পুস্তিকা’ নিয়ে।এখানে আমরা সহজ ভাষায় তুলে ধরেছি চিংড়ি চাষ সম্পর্কে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শুরু করে রপ্তানির সম্ভাবনা, খাবার ব্যবস্থাপনা, জলের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধ, স্মার্ট চাষ পদ্ধতি, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিংড়ি ফসল বীমা এবং ভারতীয় সাদা চিংড়ি তথা চাপড়া চিংড়ি, কাঁকড়া ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষের মাধ্যমে কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় - সবকিছুই আছে এই বইতে। এখানেই শেষ নয়, আমরা আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি আমাদের চাষিদের। "রিপোর্ট ফিশ ডিজিজেস অ্যাপ" - এই নতুন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে চাষিরা এখন সরাসরি জাতীয় স্তরের রোগ নিরীক্ষণ কার্যক্রম তথা ন্যাশনাল সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম অন একোয়াটিক এনিমল ডিজিজেস (National Surveillance Programme on Aquatic Animal Diseases) এর সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা -এর আওতায় চালু করা এই অ্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমাদের এই বই।আমাদের বিশ্বাস, এই বই মাছ চাষের সাথে যুক্ত সকল মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করবে। এই বই থেকে আহরণ করা জ্ঞান চাষিদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং লবণাক্ত জলজ চাষ খাতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সম্পাদকবৃন্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভারতে চিংড়ি চাষের সাম্প্রতিক অবস্থান এবং সম্ভাবনা *সি. পি. বালাসুব্রমনিয়ান, দেবাশীষ দে, পি. এস. শাইন আনন্দ, আই. এফ. বিজু, আর. অরবিন্দ, এ. পানিগ্রাহী এবং এম. কুমারন*	১ - ১৭
২.	লাভজনক চিংড়ি চাষে কৌশল: পরিপূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা *দেবাশীষ দে, কে. আম্বাশঙ্কর, জে. শ্যামদয়াল, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, টি. শিভারামকৃষ্ণন এবং কে. পি. সন্দীপ*	১৮ - ২৩
৩.	চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত গুন বিশিষ্ট জলের ব্যবস্থাপনা *আর. সরস্বতী, এম. মুরলিধর, জোস অ্যান্টনি, পি. কুমারারাজা এবং মৌমিতা আশ*	২৪ - ৩৩
৪.	চিংড়ির রোগ হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক মাইক্রোস্পোরিডিওসিস এবং (এইচপিএম) হোয়াইট ফিকাল সিন্ড্রোম (ডব্লিউএফএস) *টি. সতীশ কুমার, আর. আনন্দরাজা, সঞ্জয় দাস, এন. এস. সুধীর এবং কে. পি. জিতেন্দ্রন*	৩৪ - ৪১
৫.	স্মার্ট চাষাবাদ: তথ্য-নির্ভর চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনার বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা *এম. মুরলিধর, পি. মহালক্ষ্মী, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, জে. অশোক কুমার, জি. আর. কানাগাচিদামবরসেন, পি. কুমারারাজা এবং আর. সরস্বতী*	৪২ - ৫০
৬.	জমি, জল, খাদ্য এবং শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য নির্ধারণযোগ্য নিবিড় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা *কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, এম. কুমারন, এ. পানিগ্রাহী, কে. আম্বাশঙ্কর, জে. শ্যামদয়াল এবং কুলদীপ কে. লাল*	৫১ - ৬৩
৭.	বৈচিত্র্যপূর্ণ চিংড়ি চাষের জন্য বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাপড়া চিংড়ি *এ. পানিগ্রাহী, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, পি.এস. শাইন আনন্দ, আই. এফ. বিজু এবং এম. কুমারন*	৬৪ - ৭০

৮.	ভারতের সামুদ্রিক কাঁকড়ার চাষ : অবস্থান এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ *সি. পি. বালাসুব্রমনিয়ান, পি.এস. শাইন আনন্দ, জোস অ্যান্টনি, আই. এফ. বিজু, আর. আর. অরবিন্দ, এন. এস. সুধীর, এস. কান্নাপান এবং পি. পার্থ সারথি*	৭১ - ৮২
৯.	বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নোনাজলের মাছ চাষে উন্নতির সম্ভাবনা *এম. কৈলাসাম, আর. জয়কুমার, অরিত্র বেরা, ববিতা মন্ডল, ড্যানি থমাস, এম. মাকেশ, টি. সেন্থিল মুরুগান, আর. সুব্বুরাজ, জি. থিয়াগারাজন, ডি. রাজা বাবু এবং কে. কারাইয়ান*	৮৩ - ৯৪
১০.	ভারতের চিংড়ি চাষের বীমার অর্থনীতি: কৃষক ও বীমাকারীদের ধারণা এবং পণ্যের বিশ্লেষণ *টি. রভিশঙ্কর, আর. গীথা এবং সি. ভি. সাইরাম*	৯৫ - ১০৪
১১.	দক্ষ চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিএআর-সিআইবিএ -এর অভিনব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন *এম. কুমারন, ডি. দেবরাল ভিমলা এবং এস. জয়াপভিথ্রান*	১০৫ - ১১৫
১২.	মাছ চাষ: রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে "রিপোর্ট ফিশ ডিজিজ"	১১৬ - ১২১

ভারতে চিংড়ি চাষের সাম্প্রতিক অবস্থান এবং সম্ভাবনা

সি. পি. বালাসুব্রমনিয়ান, দেবাশীষ দে, পি. এস. শাইন আনন্দ, আই. এফ. বিজু,
আর. অরবিন্দ, এ. পানিগ্রাহী এবং এম. কুমারন

ভূমিকা

নীল বিপ্লবের সাথে যুক্ত সবচেয়ে সফল প্রজাতি হলো আমাদের সকলের প্রিয় চিংড়ি। আধুনিক মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের গল্প উপহার দিয়েছে। শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়েই চিংড়ি চাষের এই সাফল্য স্পষ্ট। ভারতে চিংড়ি উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ০.৯ মিলিয়ন টন চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে, যা নীল বিপ্লবের মাধ্যমে চিংড়ির চাষের উর্ধ্বমুখী প্রবণতার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। গত কয়েক দশকে চিংড়ি চাষে আমরা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে কিছু সমস্যাও লুকিয়ে আছে। চিংড়ি বিভিন্ন রোগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ঘন ঘন রোগের প্রাদুর্ভাব চিংড়ি চাষের জন্য বড় ধরনের হুমকি। শুধু তাই নয়, উৎপাদন এবং বিপণনের ক্ষেত্রেও নানান প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

এই প্রতিবেদনে আমরা ভারতের চিংড়ি চাষের বিবর্তনের গল্প বলব। বর্তমানে ভারতের চিংড়ি চাষ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কোন কোন রাজ্যে কত পরিমাণে চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে, চিংড়ি চাষের সাথে যুক্ত সমস্যাগুলি কি কি এবং কিভাবে সেই সমস্যাগুলি কে কেন্দ্র করে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করব।

চিংড়ি চাষ: জীবিকা থেকে বানিজ্যিক চাষ

ভারতের চিংড়ি চাষের ইতিহাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলোর মত প্রায় একই। ১৯২০ এর দশকের শুরুতে কেরালা (পোক্কালি) পশ্চিমবঙ্গ (ভেড়ি), কর্নাটক (খাজান) এবং গোয়ার (কাজান) এর এবং মোহনার সীমান্তবর্তী ধানের খেত থেকে প্রথাগত ভাবে ছোটো চিংড়ি ধরা হত এবং মায়ানমারের বাজারে রপ্তানি করা হত, যেগুলি 'প্রন পাল্প' (Prawn pulp) নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ভারতে সংরক্ষন পদ্ধতি উদ্ভাবনের কারনে বড় চিংড়ির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত রপ্তানির চাহিদা মেটানোর জন্য চিংড়ির ব্যাবসাভিত্তিক চাষ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এইভাবে ধান খেতের চিংড়ি চাষ পরিবর্তিত হয়ে ব্যাবসায়ী ভিত্তিক চাষের শুরু হয়, যেখানে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত চিংড়ির চারা উপকূলীয় এলাকা থেকে ধরে সেগুলোকে কয়েক মাস কোনোরকম খাদ্য (Supplement feed) এবং অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়া প্রতিপালন করা হত। পরবর্ত্তীকালে চাষিরা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুকুরে প্রাকৃতিক ভাবে সংগৃহীত চারা মজুত করত এবং তারপর যখন ব্যাবসাভিত্তিক হ্যাচারির শুরু হয় তখন হ্যাচারির পালন করা চারার মজুত শুরু

হয়। এই ধরনের স্বল্প উন্নত চিংড়ির চাষ কেরালায় এখনো হয়ে থাকে এবং এই স্বল্প সময়ের চাষে কোনোরূপ পরিপূরক খাদ্যের ব্যাবহার ছাড়াই চিংড়ি উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৪০০ কেজি/হেক্টর থেকে ১,০০০ কেজি/হেক্টর হয়। এখান থেকে এটি বোঝা যায় যে, পোক্কালি এর ধানের খেতে সারাবছর ধরে চিংড়ির চাষ একটি পরিবেশ ভিত্তিক জৈবিক চিংড়ি চাষের পদ্ধতি।

যদিও বা কয়েক দশক ধরে ভারতের উপকূলীয় রাজ্য গুলিতে চিংড়ি চাষের প্রচলন রয়েছে। টি এ এস পি এ আর সি (TASPARC) এর দ্বারা এমপেডা (MPEDA) এবং ডি বি টি (DBT) এর প্রকল্পের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশে বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপনের পর ১৯৯০ দশকের শুরুতে চিংড়ি চাষের পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের ১৯৭০ এর দশকে চিংড়ির উৎপাদনের পরিমান ছিল ২০ মেট্রিক টন এবং সর্বপ্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ১৯৯০ এর দশকে, উৎপাদনের পরিমান বেড়ে প্রায় ৩৫,৫৮০ মেট্রিক টন হয়। ১৯৯০ এর দশকে চিংড়ির উৎপাদনে উল্লেখ্যযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়। ১৯৯০-৯১ সালের উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৩৫,০০০ মেট্রিক টন যা ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে উৎপাদনের পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮৩,৬০০ মেট্রিক টন।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের চিংড়ি চাষ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। হোয়াইট স্পট রোগের ভয়াবহ আঘাত হানে চিংড়ি চাষের উপর। যদিও এই রোগের কারণ হিসেবে হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস কে ১৯৯৩ সালেই শনাক্ত করা গিয়েছিল, তবুও ১৯৯৫ সালের পরে এই রোগ মহামারী আকারে ধারণ করে। ফলে চিংড়ি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই ক্ষতি সত্ত্বেও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই অবস্থায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৬ সালে এক ঐতিহাসিক রায় দেন। সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে ভারত সরকার কোস্টাল একোয়াকালচার অথরিটি অ্যাক্ট (Coastal Aquaculture Authority Act) পাশ করে। এই আইনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের জন্য কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এই আইন কার্যকর করার জন্য ২০০৬ সালে কোস্টাল একুয়াকালচার অথরিটি (Coastal Aquaculture Authority বা CAA) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভেনামি চিংড়ি চাষের শুরু

১৯৯৫ এর দশক ভেনামি চিংড়ির (*P. vannamei*) চাষ শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রোগসমমূহ ভারতের চিংড়ি চাষের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর এটি নিশ্চিত হয় যে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত প্রজননক্ষম মাছ চাষ করার জন্য অনুপযুক্ত, কারণ বেশিরভাগ মাছই কোনো না কোনো রোগ দ্বারা আক্রান্ত। এর বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট প্যাথোজেন (Pathogen) মুক্ত/স্পেসিফিক

প্যাথোজেন ফ্রি (Specific Pathogen Free বা SPF) এবং বিভিন্ন বায়ো সিকিউরিটি (Biosecurity) এর মাপকাঠি মেনে তেরি করা মাছের চারা (PL) সফল চিংড়ি চাষ কে নিশ্চিত করে।

ভারত সহ, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ গুলিতে ভেনামি চিংড়ির চাষ শুরু হয়। ভারতে ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরু হওয়ার কারনে ২০১০ সালে চিংড়ির উৎপাদনে অভাবনীয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যেখানে ২০০৯ সালে উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ১ লাখ মেট্রিক টন সেটি ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৯ লক্ষ মেট্রিকটন। এটি শুধুমাত্র সম্ভব হয় জিনগত ভাবে উন্নত SPF ভেনামির চারার জন্য, এই চারার বৈশিষ্ট্য/সুবিধা গুলি নিম্নলিখিত-

১) বেঁচে থাকার হার বেশি

২) বৃদ্ধির হার বেশি

৩) খুব সহজে মানিয়ে নিতে সক্ষম

৪) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম অন্য চারার তুলনায়

৫) সহ্য ক্ষমতা অনেকাংশে বেশি

এছাড়াও কিছু জৈবিক সুবিধা যেমন পুকুরের তলদেশে খাওয়ার অভ্যেস, বদ্ধ পরিবেশে প্রজনন করানো সহজ, এই সুবিধা গুলিই সফল চিংড়ি চাষে অনেকাংশে অবদান রেখেছে।

চিংড়ি চাষের বর্তমান অবস্থা:

বর্তমান সময়ে চিংড়ি চাষ একটি বৃহৎ মাপের শিল্পে পরিণত হয়েছে। ২০২২-২৩ এর দশকে চিংড়ি উৎপাদনের পরিমান ছিল আনুমানিক ৯,০২,৫২৫ মেট্রিকটন এবং ২০২১-২২ সালের উৎপাদনের পরিমান ছিল ৯,৩০,০০০ মেট্রিক টন। সামগ্রিকভাবে চিংড়ির উৎপাদন ক্রমশ বেড়েছে।

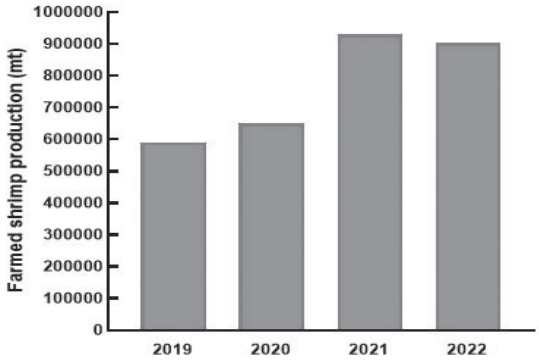

ভারতের চাষকৃত চিংড়ির উৎপাদন

২০২০-২১ রাজ্য ভিত্তিক এর দশকে চিংড়ির উৎপাদনের পরিমান

রাজ্য	বাগদা চিংড়ি		ভেনামি চিংড়ি	
	এলাকা হেক্টরে	উৎপাদন মেট্রিক টনে	এলাকা হেক্টরে	উৎপাদন মেট্রিক টনে
পশ্চিমবঙ্গ	৫০,০০০	১৯,১৯০	৬,০৫৯	৩৫,৩৯২
ওড়িশা	৫৫১	৮৭৮	১০,৬৪৯	৪৩,৬৭৭.৪
অন্ধ্র প্রদেশ	২,৫৯১	৫,২২২	৭১,৯২১	৬,৩৪,৬৭২
তামিলনাড়ু এবং পন্ডিচেরি	৩০	৮১	৮,৬০০	৪৪,৭৩৫
কেরালা	২,৮১৩	১,১২৯	১৫৭	৪২০.৮৫
কর্ণাটক	২,১৭৫	১,০০০	৯৭০	২,১৮৫.৮৪
গোয়া	০	০	০	০
মহারাষ্ট্র	০	০	১,১৮৪	৪,২৫২.১
গুজরাট	৩৫	১১৬	৮,৯৮৬	৫০,৪১০
মোট	**৫৮,১৯৫**	**২৭,৬১৬**	**১,০৮,৫২৬**	**৮,১৫,৭৪৫.২**

উপকূলীয় রাজ্য গুলির মধ্যে মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৮ শতাংশ সুধুমাত্র অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট (৬%) এবং ওড়িশা (৫%) তেই উৎপাদিত হয়।

২০২১-২০২৩ সময়কালে রাজ্যভিত্তিক চিংড়ি উৎপাদন

রাজ্য	২০২১-২০২২ (টন)	২০২২-২০২৩ (টন)
গুজরাট	২৮,০০০	৩৫,০০০
পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য অংশ	২৩,০০০	২৬,০০০
অন্ধ্র প্রদেশ		
দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ	১,১৪,০০০	১,২০,০০০
কৃষ্ণা	১,৩০,০০০	১,০০,০০০
পশ্চিম গোদাবরী	২,৭০,০০০	২,৪০,০০০
উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ	১,৬০,০০০	১,৪০,০০০
ওড়িশা	৭০,০০০	৭৩,০০০
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮,০০০	৬১,৮২৫
অন্যান্য রাজ্য	৯,০০০	৩০,০০০
দেশীয়	৩০,০০০	৬৬,০০০
মোট	**৯,৩০,০০০**	**৯,০২,৫২৫**

সোসাইটি ফর একুয়াকালচার প্রফেশনাল (Society for Aquaculture Professional বা SAP) এর প্রকাশিত এই তথ্য (ঘরোয়া চাহিদা সমেত) এবং সরকারের দ্বারা প্রকাশিত উৎপাদিত তথ্যে অনেকাংশে মিল দেখা গেছে। যদিও বা ২০২২ এর দশকে প্রায় সমস্ত এলাকাতে উৎপাদনে হালকা বৃদ্ধি দেখা গেলেও অন্ধ্রপ্রদেশের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বাজারে চিংড়ির দাম কম হওয়ায় চাষিরা তাদের পুকুরে চাষের পরিমান কমিয়ে ফেলে এলাকা অনুসারে চিংড়ি উৎপাদনের বর্ণনা নিম্নলিখিত-

গুজরাট: গুজরাট পশ্চিম উপকূলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে চিংড়ি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য এবং এই ২০২১-২২ এর তুলনায় এখন উৎপাদন বেড়েছে মূলত বাগদা (*P. monodon*) চিংড়ি চাষের জন্য। তবে ভেনামি চাষের ক্ষত্রে WSS এবং EHP এর সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী রাজ্য গুলি হল মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্নাটক, কেরালা এবং এই উপকূলের মোট উৎপাদন ১১,২০০ মেট্রিক টন।

তামিলনাড়ু: এই রাজ্যে ২০২২ সালে উৎপাদনে খুব সামান্য পরিমানে বৃদ্ধি দেখা গেছে, যদিওবা মোট চাষযোগ্য এলাকার ৬০ শতাংশতে চাষ করা হয়েছিল, তামিলনাড়ুর চিংড়ি চাষে প্রধান তিনটি এলাকা হল- পন্নেরি, মহাবলিপূরম থেকে কুড্ডালোর (Cuddalore) এবং রামান্থাপুরম।

অন্ধ্রপ্রদেশ: মাছ চাষের দিক থেকে এই রাজ্যকে ৪ টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ, কৃষ্ণা, পশ্চিম গোদাবরী, উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ প্রায় সব এলাকাতেই উৎপাদনে ঘাটতি দেখা গেছে শুধুমাত্র দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া। দক্ষিণ অন্ধ্র নেল্লোর, প্রাকশম, এবং গুন্টুর এই তিনটি জেলা এর অন্তর্গত। সফলতার হার এই জেলা গুলোতে অনেকাংশে বেশি। তবে কিছু নির্দিষ্ট এলাকাতে (যেমন কাভেলি) উৎপাদনের পরিমান অনেক বেশি, কৃষ্ণা জেলার বেশিরভাগ খামার গুলি হালকা নোনা যুক্ত এলাকার মধ্যে পড়ে এবং এই খামার গুলি আগে থেকেই মাছ চাষের জন্য ব্যাবহৃত হয়। চিংড়িকে অন্যান্য মাছের সাথে মিশ্রচাষ করেও উৎপাদন করা সম্ভব। চিংড়ির চাষযোগ্য এলাকার দিক থেকে পশ্চিমে গোদাবরী অঞ্চল, সবথেকে বড়ো চিংড়ি চাষের এলাকা হিসাবে খ্যাত। এই এলাকাতে ২০২১-২২ সালে উৎগাদনের পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় ২,৭০,০০০ মেট্রিক টন কিন্তু ২০২২-২৩ সালে উৎপাদনের পরিমান কমে হয় ২,৪০,০০০ মেট্রিক টন। চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারন হল চাষের পুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর পরবর্তী কালে উৎপাদন হ্রাসের কারনগুলি হল খুব ছোটো অবস্থায় হারভেস্ট করা। জুলাই-নভেম্বর মাসে চিংড়ির বদলে অন্যান্য মাছের চাষ করা উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের অর্ন্তগত জেলা গুলি হল গোদাবরী এবং অন্যান্য উত্তরের দিকের এলাকা বেশিরভাগ চিংড়ির হ্যাচারী গুলি গোদাবরী জেলার অর্ন্তগত এবং প্রায় ৪০% চিংড়ির চারা (PL) এই জেলাতেই উৎপাদিত হয়।

ওড়িষ্যা: এই রাজ্যে ২০২১-২০২২ সালের চিংড়ির উৎপাদন খুব সামান্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রাজ্যের উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৮০০ মেট্রিক টন। উৎপাদনের সিংহভাগ অংশই প্রথাগত চিংড়ি চাষের খামার থেকে উৎপাদিত। এই রাজ্য মূলত বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- সাইক্লোন, বড় ঝড়ের সম্মুখীন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: পূর্ব উপকূলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান রাজ্য। এই রাজ্যের ২০২১ সালে উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৮৮,০০০ মেট্রিক টন তা ২০২২ সালে কমে দাঁড়ায় ৬১,৮২৫ মেট্রিক টন।

হ্যাচারি বিভাগ (Hatchery Segment): ভারতের CAA এর তথ্য অনুসারে ভারতে সর্বমোট ৪৬২ টি পঞ্জীকৃত ভেনামির (*P. vannamei*) হ্যাচারী অবস্থিত যার সিংহভাগই অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। ২০২১ এর দশকে চিংড়ি চারা (PL) উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০ বিলিয়ন যা সর্বকালের সেরা। উপরিউক্ত হ্যাচারী গুলো ছাড়াও ভারতে ৬ টি বাগদার হ্যাচারী অবস্থিত যেখানে SPF চারা উৎপাদিত হয়। ২০২১ এর দশকে প্রায় ২.৪ লক্ষ প্রজননক্ষম ভেনামির আমদানি করা হয়েছে।

ভারতের এই বিপুল পরিমান চিংড়ির চারা (PL) এয় চাহিদার পূরণের জন্য-

চিংড়ির খামার স্থাপনের জন্য CAA এর প্রস্তাবিত সর্তগুলি নিম্নলিখিত-

১) সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত এবং কোস্টাল রেগুলেশন জোন (Coastal Regulation Zone বা CRZ) এর অর্ন্তগত কোনো এলাকা মাছ চাষের জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না তবে তবে একুয়াকালচার অথরিটি (Aquaculture Authority) এবং সরকার দ্বারা স্থাপিত অবানিজ্যিক এবং পরিয়ামূলক খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।

২) ম্যানগ্রোভ, কৃষি জমি এবং বিভিন্ন রকমের পরিবেশ গত ভাবে সংবেদনশীল এলাকা যেমন- অভয়ারণ্য, এবং সামুদ্রিক অভয়ারণ্য চিংড়ি চাষের জন্য ব্যাবহার করা উচিত নয়।

৩) চিংড়ির খামার জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা গ্রাম থেকে কমপক্ষে ১০০ মিটার দূরে স্বাপন করতে হবে যদি সে গ্রামের বা এলাকার জনসংখ্যা ৫০০ জনের কম হয়। আর গ্রামের জনসংখ্যা যদি ১০০ জনের বেশি হয় তাহলে ওই এলাকা থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে খামার স্থাপন করতে হবে। তবে কোনো বড় শহর অথবা ভ্রমন এলাকা থেকে কমপক্ষে ২ কিলো মিটার দূরে খামার স্থাপন করতে হবে।

৪) সমস্ত চিংড়ির খামার থেকে খাওয়ার জলের উৎসের দূরত্ব কমপক্ষে ১০০ মিটার হওয়া উচিত।

৫) প্রাকৃতিক খালের আশেপাশে চিংড়ির খামার স্থাপন করা যাবে না।

৬) আর যদি সাধারণ প্রাকৃতিক উৎস যেমন- ছোটো নদী বা খালের ব্যাবহার করা হয়ে থাকে তাহলে তার সঠিক পরিচর্যা করতে হবে এবং কোনো ভাবেই কোন প্রথাগত কার্যকলাপে ব্যাঘাত চলবে না।

৭) পাশাপাশি দুটি খামারের মধ্যে কমপক্ষে ২০ মিটারের দুরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক এবং খামার গুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সমেত অন্যান্য সাধারণ ব্যবস্থা গুলি যাতে থাকে সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

কমপক্ষে ৫০-১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে পার্শ্ববর্তী চাষের জমি, খাল এবং অন্যান্য জনের উৎস থেকে।

একটি নির্দিষ্ট এলাকাতে একজায়গায় অনেক সংখ্যক চিংড়ির খামার স্বাপন এড়িয়ে চলতে হবে। এরপর এই এলাকা পর্যালোচনার পর আবার নতুন খামার তৈরির অনুমতি নিতে হবে।

চিংড়ির খামার এর স্থান নির্বাচনের জন্য প্রযুক্তিগত দিকগুলি হল-

১) পর্যাপ্ত পরিমানে নোনা জলের সরবরাহ থাকতে হবে এবং জলের লবনতার পরিমান ৫ পিপিটি -৩৫ পিপিটি এর মধ্যে হওয়া উচিত।

২) জলের পি.এইচ. এর মান ৭-৮ এর মধ্যে হওয়া উচিত।

৩) মাটির গুনমান চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত।

৪) মাটির গুনগত মান এবং জলধারণ ক্ষমতা ভালো হওয়া আবশ্যক।

চিংড়ি চাষের অগ্রগতি

ভারত চিংড়ি চাষে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে এবং তার সাথে সাথে নতুন প্রযুক্তির ও উদ্ভব ঘটে চলেছে, চিংড়ি চাষ মূলত হল ভেনামি চিংড়ির চাষ, যা খুব সাধারন চাষ পদ্ধতি থেকে বিবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিকে বড় মানের পুকুরে খুব কম পরিমানে মাছের চাষ করা হত। তবে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েটরে খুবই উচ্চ ঘনত্বে পুকুরের নিয়মিত জল পরিবর্তন, জলের পরিবেশের নিয়ন্ত্রন এবং খুব কড়াকড়ি ভাবে জৈব নিরাপত্তা মেনে চিংড়ির চাষ হয়ে থাকে।

আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হলে আমাদেরকে ২ টি ধাপে চিংড়ির চাষ করতে হবে- (১) প্রথম ধাপে চারা গুলি ২১-৩০ দিন নার্সারি পুকুরে পালন করতে হবে এবং (২) দ্বিতীয় ধাপে ওই নার্সারি পুকুরের চারা গুলিকে পালন পুকুরে (grow out) ২-৩ মাস প্রতিপালন করতে হবে। এই চিংড়ি শিল্পে / চাষে নার্সারি পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম যেমন- প্রায় সব মাছের সাইজ একই মাপের হয়,

বেঁচে থাকার হার বেশি, খাদ্যের সঠিক ব্যাবহার/খাদ্যের অপচয় রোধ, হারভেস্ট বা আহরনের পরিমান তুলনামূলক বেশি হয়। চাষের দিন সংখ্যা হ্রাস, উৎপাদনে পরিমান বেশি উদাহরনস্বরূপ ২০-৩০ ভাগ উৎপাদনের পরিমান বেশি প্রথাগত একক ধাপ চাষের তুলনায় সফলতার বিভিন্ন স্তরের ওপর নির্ভর করে নার্সারি পালনকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগকরা হয়েছে যথা-

১) পরিষ্কার জলের নার্সারি পুকুর

২) বায়োফ্লক (Biofloc) নির্ভর পুকুর

৩) রিসার্কুলেটরি একুয়াকালচার সিস্টেম (RAS) ভিত্তিক পুকুর

৪) মিশ্র পুকুর

৫) HDPE / পলিথিন দ্বারা প্রস্তুত পুকুর (০.৫-২,০০০ বর্গ মিটার)

বর্তমানে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে বায়োফ্লক টেকনোলজি বা BFT হল একটি অভিনব প্রযুক্তি, এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় / অনুপাতে কার্বন ও নাইট্রোজেন এবং হেটেরোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া থাকা আবশ্যক এবং এই ব্যাকটেরিয়া গুলি নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ বিপাক করতে এবং জলের গুনগত মান সংরক্ষন করতে সক্ষম, এর দ্বারা উৎপাদিত ফ্লকগুলি অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদানের উৎস হিসেবে কাজ করে। বায়োফ্লোক এর কিছু সুবিধার সাথে সাথে এর সীমাবদ্ধতা ও আছে যেমন- এই প্রযুক্তির পরিকাঠামো স্থাপনের জন্য এটি যথেষ্ট ব্যায়বহুল, এতে অতিরিক্ত বিদ্যুত এর চাহিদা, অতিরিক্ত পরিমান এয়ারেশনের চাহিদা এবং সর্বোপরি পরিচালনা করা খুবই জটিল পদ্ধতি।

আর একটি খুবই জনপ্রিয় পদ্ধতি মিক্সোট্রপিক নামে পরিচিত। যেখানে হেটেরোট্রপিক এবং মাইক্রো অ্যালগি ছোটো উদ্ভিদকনা কে পরিপূরক হিসেবে ব্যাবহৃত হয়, যেখানে আরও একটি নির্দিষ্ট পরিমান কার্বন ও নাইট্রোজের অনুপাত না দিয়ে জৈব কার্বন দেওয়া হয়।

আই সি এ আর সি আই বি এ (ICAR-CIBA) ছোটো চিংড়ির চারা প্রতিপালনের জনও কপিফ্লক (Copefloc) পদ্ধতির তৈরি করেছে। এই Copefloc ধানের কুঁড়ো, গুড় / মোলাসেস এবং ইস্টকে গাঁজিয়ে তৈরি করা হয় এবং সাথে কিছু পরিমান Copepod প্রজাতি যোগ করা হয়। এরপর নার্সারি ট্যাঙ্কে ১২ দিনের ছোটো ভেনামির চারা (PL) ১,০০০-১০,০০০ PL/m^3 ঘনত্বে মজুত করা হয়, Copefloc একদিন অন্তর অল্প পরিমানে দিতে হবে এবং সাথে সপ্তাহে ২০ ভাগ জল পরিবর্তন করতে হবে, এবং জলের লবনতার পরিমান ২৩ পিপিটি বজায় রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে গাঁজানো জুস দিতে হবে এবং জলে কোপিপড (Copepod) এর ঘনত্ব প্রতি লিটারে ১,০০০ টি বজায় রাখতে হবে। পুরো চাষ/কালচার চলাকালীন বজায় রাখতে হবে। চাষ/culture চলাকালীন ২০ এর কম নার্সারী ফিডের প্রয়োজন হয় এবং এটি Copefloc এর গুনগত মানের উপর নির্ভর করে, Copefloc

এই পদ্ধতিতে ভেনামির চারার বৃদ্ধি কম খাদ্য ব্যাবহারে বেশি লক্ষ করা গেছে যেটির সরাসরি গুরুত্ব/সুবিধা ভেনামির পালন পুকুরে লক্ষ্য করা গেছে।

নার্সারি পুকুর বাইরে, খামারের পাশেও তৈরি করা যেতে পারে, যদিও বা ঘরের ভেতরে নার্সারী এর ব্যাবস্থা অনেকটাই সুরক্ষিত, ঘরের বাইরের নার্সারী পুকুরের তুলনায়। HDPE/পলিথিন দ্বারা নির্মিত পুকুরে অন্ধ্রপ্রদেশের চাষীরা অনেক সফল ভাবে চাষ করে চলেছে।

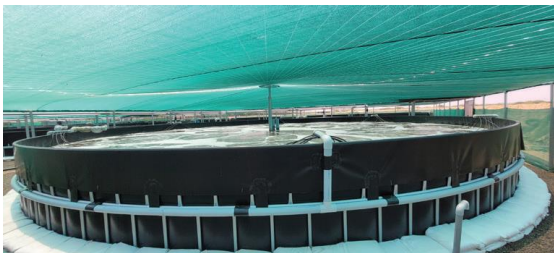

পুনরায় বাগদা চিংড়ি চাষের দিকে প্রবণতা

বিশ্বের বাজারে তথা ভারতের বাজারে বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*) আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, যদিওবা ১৯৯০ দশকের পরে বাগদা চিংড়ির চাষে মন্দা আসতে থাকে। এই মন্দার কারন অনেক- প্রতিনিয়ত রোগের প্রাদুর্ভাব, ছোটো অবস্থায় মাছের আহরণ/ হারভেস্ট, মাছের বৃদ্ধি কমে যাওয়া এবং অবশেষ এই সব কারন বশত বাগদা চিংড়ির চাষ কম লাভজনক হয়ে ওঠে। বাগদা চিংডির এই বিফলতার পর আমেরিকার নতুন SPF ভেনামি আসার পর চিংড়ি চাষে নতুন রাস্তা খোলে, তবে কিছু বছর ধরে বাগদা চিংড়ির চাষে কিছুটা বৃদ্ধি দেখা গেছে SPF বাগদা চিংডির উপলব্ধতার কারনে। এই বাগদা চিংড়ির চারাতে EHP এবং হোয়াইট ফিকাল রোগ (white fecal disease) হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কম এবং এই চারা ভেনামির চারার থেকে তুলনামূলক ভালো।

গুজরাটের নভসারির ICAR-CIBA এর ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রে SPF বাগদা চিংড়ির একটি প্রয়োগমূলক চাষ করা হয়েছিল। এই প্রয়োগমূলক চাষে/কালচারে প্রতি বর্গমিটারে ১৫ টি করে চারা ১০৫ দিনের চাষ করা হয়েছিল এবং মাছগুলিকে ৩৮ শতাংশ প্রোটিনযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল সবশেষে (১০৫ দিনের পর) মাছের ওজন হয় ২৯.৫ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার (Survival rate) ছিল ৭১ শতাংশ।

প্লাস্টিক আস্তরণযুক্ত পুকুরে চিংড়ি চাষ:

সাধারনত উপকূলীয় ঈষৎ নোনা জলের ক্ষেত্রে/এলাকা গুলিতে চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে, আবার সব রকমের মাটি চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, উদাহরণস্বরূপ কম জলধারন ক্ষমতা সম্পন্ন মাটি পুকুর তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়। একইরকম ভাবে পুকুরের মাটিতে যদি জৈব পদার্থের পরিমান বেশি থাকে

তাহলে মাটির পি.এইচ এর মান স্বাভাবিক ভাবেই কম হবে যেটি চিংড়ির বৃদ্ধিতে এবং বেঁচে থাকতে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে পুকুরে পলিথিন পেতে চাষ করা অন্যতম, তবে বেশ কিছু বছর ধরে এই চাষ পদ্ধতির বিস্তার দেখা গেছে মাছ চাষে উভয় প্রকারই HDPE এবং PVC পুকুরে ব্যাবহৃত হয়। এই জিনিস/পদার্থগুলি UV রশ্মি থেকে ক্ষয়ের রোধ করতে পারে এমনকি অনেক বছর টেকসই হয়। এই পলিথিনের আস্তরন কমপক্ষে ০.৭৫ মিলিমিটার মোটা হওয়া আবশ্যক বিশেষ করে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে, চিংড়ির পুকুরে খুব ভালো করে পলিথিনে আস্তরন দিয়ে চাষ করলে খুব সহজভাবে বর্জ্যপদার্থ এবং নোংরা গুলিকে বাইরে বের করা যায়, পুকুরটিকে মাঝের দিকে ঢালু করতে হবে যাতে খুব সহজেই ওই বজ্যপদার্থ, নোংরা গুলি ও খালে জমা হতে পারে।

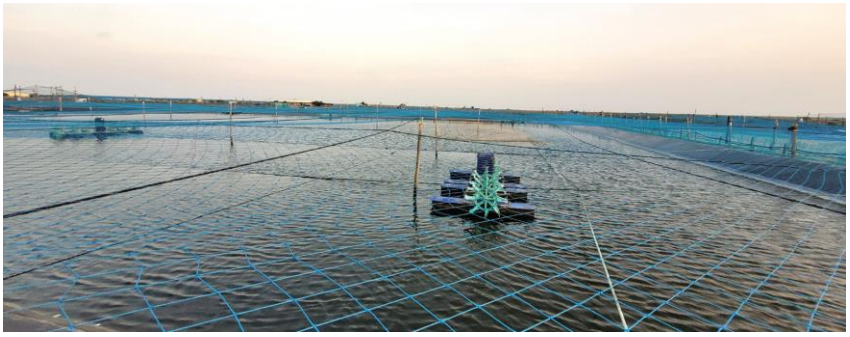

সুবিধা:

১) এই প্লাস্টিক/পলিথিনের আস্তরন জলকে সরাসরি অ্যাসিড-সালফেট যুক্ত মাটির সংস্পর্শে আসতে দেয় না। এর ফলস্বরূপ মাটি ও জলের কম পি.এইচ এর সমস্যা দেখা যায় না, জলে ও মাটিতে কম পি.এইচ. মূলত বৃষ্টিকালে চিংড়ির পুকুরে সমস্যার সৃষ্টি করে।

২) জল ও মাটির সাথে সরাসরি কোনো সংস্পর্শ না থাকার কারনে পুকুরে জলের গুনগত মান খুব সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায় এবং এর কোনোরকম বিরূপ প্রভাব ও পড়েনা।

৩) জল ও মাটির সংযোগ না থাকার বিভিন্ন রকমের সমস্যা যথা- মাটিতে অ্যাসিডের পরিমান, মাটিতে লবনাক্ততা বেড়ে যাওয়া (মাটি থেকে লবন ওঠা / সাদা হয়ে যাওয়া) এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা, এর প্রতিরোধ করে।

৪) পুকুরে পলিথিন/প্লাস্টিকের আস্তরনের কারণে পুকুর পরিস্কার ও প্রস্তুতি খুব অল্প সময়ে হয়ে যায় (৪-৮ দিনের মধ্যে) যা সাধারন মাটির প্রথাগত পুকুরের তুলনায় অনেক কম (প্রায় ৩০-৪৫ দিন)।

৫) এই ধরনের পুকুর থেকে মাছের আহরণ/হারভেস্ট খুব সহজে করা যায় এবং পুকুর পরিস্কারের জন্য কোনোরূপ ট্রাক্টরের দরকার হয়না।

৬) পুকুরে কালচার/চাষ চলাকালীন নোংরা ও বের্জ্য পদার্থ গুলিকে নিয়য়িত বের করে দেওয়া হয় যার ফলস্বরূপ পুকুরের তলদেশে খুব অল্প পরিমান বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।

৭) পুকুরে পলিথিনের আস্তরন, স্রোতের (জোয়ার ভাটা, বাতাস, এয়ারেটর) হাত থেকে পুকুরের বাঁধের ক্ষয় হওয়া প্রতিরোধ করে এবং পুকুরের পরিচর্যার খরচা কমায় এবং কম জায়গাতে ফসলের পরিমান বৃদ্ধি করে।

৮) এই ধরনের পুকুরে চিংড়ি খুব পরিষ্কার হয় (যেহেতু পুকুরের তলদেশে কোনারূপ নোংরা থাকে না) তাই মাছের দাম তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

৯) সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পলিথিনের আস্তরন যুক্ত পুকুরে বিভিন্ন রকম EHP গত রোগের সমস্যা খুব সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

অসুবিধা:

১) যথেষ্ট ব্যায়সাপেক্ষ এবং বেশি শ্রমের প্রয়োজন।

২) পুকুরের উপরিভাগে শ্যাওলার আস্তরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।

৩) কালচারের দিন যত বাড়ে, পুকুরে ধীরে ধীরে ফসফরাস জমা হতে থাকে এবং শ্যাওলা জনিত সমস্যার প্রার্দুভাব ঘটে। এছাড়াও পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান হ্রাস পায়, বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD) এর মান বাড়ে, প্লাঙ্কটন মরে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

৪) এই ধরণের পুকুরে বিদ্যুতের চাহিদাও বেশি হয়।

চিংড়ির পালন পুকুরে চারা মাছ ছাড়ার আগের ব্যাবস্থাপনা:

চিংড়ি চাষে সফলতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল সঠিক পরিচালন ব্যাবস্থা এবং পুকুর প্রস্তুতির কয়েকটি গুরুত্ব ধাপ নীচে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল-

পুকুরের তলদেশ শুকানো:

প্রত্যেকবার পুকুর থেকে মাছ তুলে নেওয়ার পর (হারভেস্টিং) পুকুরের তলদেশকে মাটিতে ফাটল আসা অব্দি শুকাতে হবে, এই প্রক্রিয়াটি আগের কালচারের/চাষের বর্জ্য পদার্থ ও বিভিন্ন জৈবিক পদার্থ গুলিকে অক্সিডাইজ হতে সাহায্য করে, সাধারনত পুকুর জল বের করার পর ৭-১০ দিন

মাটিতে ২৫-৫০ মিমি ফাটল আসা অব্দি শুকাতে দিতে হবে। এটি বিভিন্ন রোগের আক্রমন প্রতিরোধ করে এবং চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

লাঙল দেওয়া:

লাঙল দেওয়ার জন্য পুকুরের তলদেশের নোংরা, বিভিন্ন জৈবিক পদার্থ এবং ক্ষতিকারক গ্যাসকে বের করতে সাহায্য করে, সাধারণত অ্যাসিড যুক্ত মাটিতে লাঙ্গল করা উচিত নয় কারণ এটি মাটির পি.এইচ. আরো কমে যায়।

উপরিভাগের মাটির নিস্কাশন:

পুকুরে যাতে কোনো রকম অবাঞ্ছনীয় জীবানু বৃদ্ধি পেতে না পারে তার জন্য পুকুরের তলদেশের উপরের কালো মাটি এবং বর্জ্য পদার্থ এর নিষ্কাশন খুবই জরুরি। এই বর্জ্য পদার্থ গুলিকে বের করে পুকুর থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ফেলবে যাতে সেগুলি আর পুকুরে ফেরত আসতে না পারে, যেসব পুকুরের মাছের মজুত ঘনত্ব বেশি, সেসব পুকুরের তলদেশের উপরিভাগের পুরো মাটি বের করে দিতে হবে। তবে যদি পুকুরে মাছের সংখ্যা কমথাকে তবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফিডিং জোন (Feeding Zone) এর মাটি বের করলেই হবে।

যদি পুকুর অনিষ্কাশন যোগ্য হয়/তলদেশে অ্যাসিড-সালফেট যুক্ত মাটি থাকে

- জল ঢোকানোর রাস্তা (Inlate gate) থেকে জল বের করানোর রাস্তা (drain gate): ১:৫০০০ অনুপাতে চালু থাকা আবশ্যক, জল বের করানো জন্য।
- বার বার জলের পরিবর্তন করতে হতে পারে
- তলদেশের মাটির পি.এইচ. এর উপর ভিত্তি করে চুলনের প্রয়োগ করতে হবে। ২০০-১,০০০ কেজি/হেক্টর চুন দিতে হবে যদি পি.এইচ ৬.৫-৭.৫ এর মধ্যে থাকে
- মাটি সংশোধনের জন্য রাসায়নিক প্রয়োগ: ভেজ নাইট্রেট লবন ২০-৪০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটারে (এই লবন অনুজীবের জন্য জৈব পদার্থ ধ্বংসকারী নাইট্রোজেনের উৎসকে বাড়ায়)
- যদি পুকুর EHP দ্বারা আক্রান্ত হয়: ৬ টন প্রতি হেক্টর হারে পোড়াচুন (CaO) ব্যাবহার করতে হবে এবং মাটির পি.এইচ. ১২ রাখতে হবে কমপক্ষে ৭ দিনের জন্য।

জলের প্রবেশ করানো:

- পাম্প বা সরাসরি জোয়ারের জল থেকে প্রবেশ করানো যেতে পারে (যখন পুরোপুরিভাবে জোয়ারের জল থাকবে)
- চারটি ধাপে জলকে ফিল্টার করতে হবে (২০, ৪০, ৬০ এবং ৮০ মেস)

- যদি জলের কাদাকনা তথা অস্বচ্ছতার পরিমান বেশি থাকে (২৫০-৫০০ ntu)- একটি রির্জাভারে জলকে থিতানোর জন্য রাখতে হবে এবং PAC (Poly Aluminium Chloride) ৫-৭ পিপিএম হারে এবং পটাশ ($KMnO_4$) ৩ পিপিএম হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্লিচিং পাউডার: ক্লোরিনের পরিমান কমপক্ষে ১০-১৫ পিপিএম আছে এমন ব্লিচিং পাউডার ৫-৬০ পিপিএম হারে প্রয়োগ করতে হয়ে।
- এগুলি প্রয়োগের মাত্রা জৈব বস্তুর পরিমান অথবা অথবা WSSV ভাইরাসের পরিমানে উপর নির্ভর করে।

পুকুরে বিভিন্ন রকমের অবাঞ্ছিত প্রাণী ও জীবাণুর প্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে। এর জন্য পুকুরে জল প্রবেশ করানোর সময় জলকে জালের সাহায্যে ছেঁকে পুকুরে ভর্তি করতে হবে। পুকুরের বিভিন্ন ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে ব্লিচিং পাউডার ৬০০ পিপিএম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাছ চাষের জন্য সঠিক জলের গুনগত মান ২ নং তালিকায় দেওয়া হল। পুকুরে চাষ চলাকালীন একটি রির্জাভারে চাষের উপযোগী জল জমা করে রাখতে হবে।

জৈব নিরাপত্তা (Biosecurity):

- চাষের পুকুরে পাখির প্রবেশ আটকানোর জন্য পুকুরের উপরে জালের আচ্ছাদন, চকচকে পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যাগ ইত্যাদি ব্যাবহার করা যেতে পারে।
- পুকুরে চারিপাশে জাল দ্বারা ঘিরতে হবে যাতে সহজে কোনো প্রাণী (কাঁকড়া, সাপ, গোরু ইত্যাদি) প্রবেশ করতে না পারে।
- খামারে প্রবেশের আগে পটাশ জল এ ($KMnO_4$: ৫০০ পিপিএম হারে) পা ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে।
- খামারে প্রবেশের আগে হাত আয়োডিনের দ্রবনে (Povidone-iodine ১০০ পিপিএম হারে) ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে।
- প্রত্যেক পুকুরের জন্য আলাদা আলাদা খাওয়ার দেওয়ার (Feeding) বালতি ব্যাবহার করতে হবে।

চুনের প্রয়োগ:

পুকুর প্রস্তুতির সময় চুন, মাটির পি.এইচ. ও ক্ষারকতার (Alkalinity) এর পরিমান নিয়ন্ত্রন করতে সাহায্য করে। কোন রকমের চুন কতটা পরিমানে ব্যাবহার করা হবে তা মাটির ও জলের পি.এইচ. এর ওপর নির্ভর করে, তাই চুন প্রয়োগের আগে মাটির ও জলের পি.এই.চ. পরিমাপ করতে হবে। মাটির ও জলের পি.এইচ., পি.এইচ. মিটারের সাহায্যে খুব সহজে পরিমাপ করা যায়, যদি মাটির

পি.এইচ. ৫ এর থেকে বেশি থাকে তাহলে সাধারণত এগ্রিকালচারাল লাইম বা ডলোমাইট ব্যাবহার করা যেতে পারে আর যদি মাটির পি.এইচ. ৫ এর কম থাকে তাহলে পোড়াচুন বা জলযুক্ত চুন/ভেজা চুন ব্যাবহার করা যেতে পারে। পুকুরে ব্লিচিং পাউডারকে জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যাবহার করার ৩-৪ দিনের মধ্যে যদি চুনের ব্যাবহার করা হয় তাহলে তা জীবানুনাশকের কার্যকারীতাকে হ্রাস করে।

চিংড়ি চাষের জন্য মাটির আদর্শ মান

মানদণ্ড	আদর্শ পরিসীমা
pH	৭.০-৮.০
জৈব কার্বন (%)	১.৫-২.০
লভ্য নাইট্রোজেন (মি.গ্রা./১০০ গ্রা.)	৫০-৭০
লভ্য ফসফরাস (মি.গ্রা./১০০ গ্রা.)	৪-৬
ক্যালসিয়াম কার্বনেট (%)	>৫.০
বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (dS/m)	>৪
মাটির গঠন	বেলে দোআঁশ বা কাদামাটি

চিংড়ি চাষের জন্য জলের আদর্শ মান

তাপমাত্রা (^{o}C)	২৫-৩৩
লবনতা (পিপিটি)	১০-৩৪
পি.এইচ.	৭-৯
স্বচ্ছতা (cm)	২৫-৫০
দ্রবীভূত অক্সিজেন (ppm)	৪-৬
ক্ষারকতা (Alkalinity) (ppm)	৫০-৩০০
নাইট্রেট (ppm)	<০.০৩
নাইট্রাইট (ppm)	<০.০১
অ্যামোনিয়া (ppm)	<০.০১

সার প্রয়োগ:

মাছ চাষের পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হল পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি করা। এগুলি পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যা প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ ভাবে চিংড়ির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, এছাড়াও এটি জলের স্বচ্ছতার স্তরের নিয়ন্ত্রন করে (২৫-৪০ সেমি) যা বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকারক শৈবালের বৃদ্ধি প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফাইটোপ্লাংটন (সবুজ উদ্ভিদকনা) পুকুরের জলের গুনগত মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পুকুরের মাটির উর্বরতার উপর নির্ভরকরে পুকুরে সারের প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রধানত ২ প্রকারের হয় যথা (১) জৈব সার এবং (২) অজৈব সার

জৈব সার হিসেবে গোরুর গোবরকে শুকিয়ে ৫০০-২,০০০ কেজি প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং অজৈব সার হিসেবে ইউরিয়া এবং SSP ২৫-১০০ কেজি প্রতি হেক্টর হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই সার প্রয়োগের হার মাটিতে উপস্থিত কার্বন, নাইট্রোজেন (৬০-৭৫ এম.জি/১০০ গ্রা, মাটি) এবং ফসফরাস (৪-৬ এম.জি/১০০ গ্রাম মাটি) এই মাত্রার উপর নির্ভর করে করতে হবে, এরপর জলের রং বাদামী সবুজ হলে জলের স্বচ্ছতার পরিমাপ করতে হবে স্যাচিডিস্ক এর সাহায্যে এর পরিমাপ যদি ২৫-৪০ সেমির বেশি না হয় তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে চারা মজুত করার জন্য পুরোপুরি ভাবে প্রস্তুত।

জৈব জুসের প্রয়োগ:

বর্তমানে জল পরিবর্তন না করে (zero water exchange) চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রোবায়োটিক হিসেবে ইস্ট দিয়ে তৈরি করা জৈব জুস হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে, এই জৈব জুস প্রস্তুতির উপকরন গুলি নিম্নলিখিত-

ধানের তুষ চাল সমেত – ৬০ কেজি

গুড় বা মোলাসেস – ৩০ কেজি

ইস্ট (*Saccharomyces cerevisiae*) – ২ থেকে ৪ কেজি

এগুলিকে ২ দিন (48 ঘন্টা) গাঁজিয়ে এক হেক্টর পুকুরে প্রয়োগকরা যেতে পারে, এই জুস সপ্তাহে ২ বার ব্যাবহার করা যেতে পারে, ১-২ পিপিএম হারে পুকুরের প্রাথমিক খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধি জন্য।

পুকুরে মজুতকরন:

চারার গুনমান: PL বা চিংড়ির চারা উৎপাদনের পরিবর্তনশীলতা চিংড়ি চাষ এর প্রযুক্তিকে অবিশ্বাস্য এবং চাষের সম্ভাবনাকে হ্রাস করেছে, সুতরাং লার্ভা বা PL নির্নয়ের জন্য কয়েকটি মানদন্ডের উপর নজর দিতে হবে যেমন- মাছগুলির মধ্যে স্ট্রেসের পরিমাণ এবং তাতে কোনো প্রকার রোগ আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এছাড়াও লার্ভা বা PL গুলি যাতে বড়ো ব্রুডার মাছের হয় তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

চিংড়ির চারা সাধারণত ২৮ পিপিটি এর অধিক লবনযুক্ত জলে উৎপাদন করা হয়, কিন্তু সাধারণত লার্ভা বা PL গুলিকে যে পুকুরে ছাড়া হয় সেখানে লবনতার পরিমান অনেক কম থাকে বা কিছু ক্ষেত্রে বেশি থাকে, এবং PL গুলিকে পলিথিনে বেঁধে থার্মোকলের বাক্সে পরিবহন করা হয়। তাই

সাধারনভাবেই এই ব্যাগ- গুলি তাপমাত্রা কম থাকে। তাই লার্ভা বা PL গুলিকে পুকুরে ছাড়ার আগে পুকুরের জলে ওই পলিথিনের ব্যাগ গুলিকে ৩০ মিনিট – ১ ঘন্টা ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর মাছের বা PL গুলিকে ধীরে ধীরে পুকুরের জলের গুনমানের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পুকুরে ছাড়তে হবে।

চিংড়ি চারার মান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা

মানদণ্ড	আদর্শ
রঙ	রঙ হালকা থেকে গাঢ় বাদামী
তৎপরতা	খুব সক্রিয়
খাদ্যাভ্যাস	সহজেই খাবার গ্রহণ এবং খাওয়া
পাকস্থলী	পূর্ণ পাকস্থলী এবং লেজের মাংসপেশী থেকে পশ্চাৎ পাকস্থলীর অনুপাত ৪:১ বা তার বেশি
যকৃৎ-অগ্ন্যাশয়	নমুনার কমপক্ষে ৯০% তে উন্নত এবং তেল কণিকা দিয়ে পূর্ণ
মুখের কাঁটা	৫ টির বেশি থাকা উচিত
দেহের দৈর্ঘ্য	১২ মি.মি. বা তার বেশি
আকারের পার্থক্য	১০% এর কম
উপাঙ্গ	কোনো বিকৃতি ছাড়াই
ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের জন্য পিসিআর পরীক্ষা	নেতিবাচক
রঞ্জক কণিকা	মাঝের পেটের রেখা বরাবর ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত এবং অবস্থিত
টিকে থাকার জন্য চাপ পরীক্ষা	লবণাক্ততা হ্রাসের জন্য ১০০% এবং ফর্মালিন পরীক্ষার জন্য ৯০% এর বেশি
পিএল পর্যায়	পিএল ১২ এবং তার উপরে, ছোট আকারের পিএল-এ পর্যাপ্ত ফুলকা বিকাশ থাকবে না
WSSV/EHP	রিয়েল টাইম পিসিআর, স্টেপ নেস্টেড পিসিআর অনুসারে উপস্থিত নয়
পচন	অনুপস্থিত
দূষণ	কোনো দূষণকারী জীব ছাড়াই পরিষ্কার

বর্তমান চিংড়ি চাষের সমস্যা এবং তার সমাধান:

বর্তমান দিনের সবথেকে বড় সমস্যা হল অতিরিক্ত উৎপাদনের কারনে চিংড়ির বাজারগত মূল্য হ্রাস এবং সমস্ত এশিয়ার দেশগুলি এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। চিংড়ি খুব অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন

করা যায়। তাই এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আমাদের চিংড়ির অত্যধিক পরিমানে উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, তাবে এটি খুব ক্ষনস্থায়ী সমাধান, তবে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে উৎপাদনের দক্ষতার বৃদ্ধির প্রতি নজর দিতে হবে। আমাদের দেশীয় বাজারে অনেক সুযোগ আছে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন- রেডি টু ইট, রেডি টু কুক, রেডি টু হিট ইত্যাদি পন্য উৎপাদনে বিশেষ নজর দিতে হবে। এইভাবে পণ্যসামগ্রীর বৈচিত্র্যতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে, তবেই চিংড়ি চাষ আরও লাভজনক হবে। এখন বাগদা চিংড়ির উৎপাদনে আরেকটি সুযোগ আছে।

উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি কয়েকটি কৌশল হল

- চাষের দিনসংখ্যা কমাতে হবে
- মজুত ঘনত্ব কমাতে হবে
- ইনফ্রাস্ট্রাকচারে পরিবর্তন করতে হবে যথা- পলিথিনের আস্তরণ দিয়ে চাষ EHP প্রতিরোধের জন্য খুব কার্যকরী
- সঠিক জলের গুনগতমানের পরিচর্যা করতে হবে
- নার্সারি পুকুরের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে
- মাছের হারভেস্ট এবং পরবর্তী কালচারের পুকুর প্রস্তুতির মধ্যে কিছু দিনের ব্যাবধান রাখতে হবে
- চিংড়ির সাথে অন্যান্য প্রজাতির/মাছের (Poly culyure) চাষ করতে হবে

এই শিল্প কতটা প্রভাবশালী তা এই শিল্পে বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধির হার দেখেই বোঝা যায়, আরও সঠিক ভাবে নার্সারী পুকুরে মাছের চাষ, বিকল্প খাদ্য উপাদানের ব্যাবহার, সবুজ শক্তি (সোলার, বায়ু শক্তি) ব্যাবহারের মাধ্যমে এবং আরও নতুন নতুন প্রযুক্তির (যথা RAS পদ্ধতিত্য) সাহায্যে চিংড়ি চাষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনুমান নির্নয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষকরে নজর দিতে হবে।

লাভজনক চিংড়ি চাষে কৌশল: পরিপূরক খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দেবাশীষ দে, কে. আম্বাশঙ্কর, জে. শ্যামদয়াল, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম,
টি. শিভারামকৃষ্ণন এবং কে. পি. সন্দীপ

ভূমিকা

চিংড়ি চাষে পরিপূরক খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি চিংড়ির বৃদ্ধি তথা জলের গুণমানের উপর প্রভাব ফেলে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। খাদ্যের ব্যবস্থাপনা মানে এটা বোঝায় যে চাষের পুকুরে খাদ্যকে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে যাতে খাদ্যের নষ্টের হার কম হয়। পরিবেশের উপর যাতে কম প্রভাব পড়ে এবং ফীড কনভারশন রেশিও (FCR) বা খাদ্য রূপান্তরের অনুপাত যাতে ভালো হয়। মাটি ও জলের উপর যাতে প্রভাব না পড়ে এবং সর্বোপরি চিংড়ির বৃদ্ধি ও উৎপাদনের হার বেশি হয়। এখান থেকে এটি মাথায় রাখতে হবে যে একটি ভালো মানের খাবারও খারাপ ফলাফল দিতে পারে যদি খাদ্যের ব্যবস্থাপনা খারাপ হয়। অপরদিকে একটি মোটা মুটি মানের খাদ্যও ভালো ফলাফল দিতে পারে যদি খাদ্য ব্যবস্থাপনা ভালো হয়। সুতরাং প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেটার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস বা Better Management Practice (BMP) বা ভালো পরিচালন ব্যবস্থা এবং সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Feed Management) সফল চিংড়ি চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সফল চিংড়ি চাষের জন্য চাষীরা কিভাবে সঠিক খাদ্য পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা নীচে দেওয়া হল-

কিভাবে সঠিক ভাবে ভালো মানের চিংড়ির খাদ্য নির্বাচন করবে?

একটি ভালো মানের খাদ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এই খাদ্যের কারনে মাছের বৃদ্ধির হার এবং FCR বা খাদ্যের রূপান্তরের হার খুব ভালো হবে। পুকুরের জলের গুণগত মান এবং চিংড়ির স্বাস্থ্যের উপর কোনরূপ প্রভাব ফেলবে না। অতএব খাদ্যের গুণগত মান খাদ্যের জৈবিক, ভৌতিক এবং পুষ্টিগুণের ওপর নির্ভর করে। চাষীদের খাদ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম খাদ্যের ভৌতিক বা Physical মানের দিকে নজর দিতে হবে।

ভৌতিক গুণ বা Physical quality

একটি ভালো মানের খাদ্যের দানার সাইজ বা মাপ এবং এটা দেখতে একই রকমের হতে হবে। খাদ্যের দানা গুলি ভাঙ্গা এবং কোনো রকমের গুঁড়ো থাকবে না। খাদ্যের মধ্যে একটি তরতাজা ভাব এবং সঙ্গে হালকা সুন্দর মেছোগন্ধ থাকবে তবে এই গন্ধ খুব বেশি বা খুব কম থাকা আদর্শ নয়। খাদ্যে কোনোরূপ ছত্রাক এবং দলাপাকিয়ে থাকা উচিত নয়। খাদ্যের ভঙ্গুরতা এবং পুষ্টির অবক্ষয় চিংড়ির খাদ্যের গুণমানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পুষ্টিগুণের অবক্ষয়ের সাথে সাথে

আর্থিক ক্ষতি করে এবং এই প্রকার খাদ্যের প্রয়োগ পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। খাদ্য দানার স্থায়িত্ব, ভঙ্গুরতা এবং পুষ্টিগুণের অবক্ষয়তা চাষীদের ভালো মানের খাদ্যের নির্ণয়ে সাহায্য করে। খাদ্যের হালকা জল শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে তা সহজে পরিবেশের সাথে মিশে যেতে পারে।

রাসায়নিক গুণ (Chemical quality)

পরিপূরক খাদ্যকে এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে খাদ্যটি চিংড়ির সমস্ত রকমের পুষ্টি মানের প্রয়োজনীয়তাকে পূরন করে। তাই খাদ্য উৎপাদন কারীরা খাদ্যে উপস্থিত খাদ্য উপাদানের নাম ও তা কত পরিমানে আছে তা ফিডের বস্তার উপর লিখে দেয় যাতে চাষীরা তাদের খাদ্য উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যকে নির্বাচন করতে পারে। খাদ্যকে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক এবং নিষিদ্ধ রাসায়নিক মুক্ত হতে হবে।

জৈবিক গুণ (Biological quality)

খাদ্যটিকে চিংড়ির কাছে আকর্ষনীয় এবং সুগন্ধ যুক্ত হতে হবে এবং খাদ্যের গ্রহনে যাতে অসুবিধা না হয়। খাদ্যকে সহজ পরিপাক যোগ্য সঙ্গে কম FCR এবং বৃদ্ধির হার বেশি হতে হবে। আর জলের গুণমানের উপর খুব কম পরিমাণ প্রভাব পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে।

খাদ্য সংরক্ষন (Feed preservation)

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তথা চিংড়ি চাষে খাদ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিডের বস্তাগুলি কেনার সময় প্রথমেই ওজন করে নিতে হবে এবং কোনো রকম কাঁটাছেঁড়া বস্তার মুখ খোলা না বন্ধ তা ভালো করে দেখে নিতে হবে। এছাড়াও অবশ্যই ফিডের উৎপাদনের তারিখ বা ম্যানুফ্যাকচার ডেট এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বা Expiry date দেখে নিতে হবে। কয়েকটি খাদ্য সংরক্ষনের পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল-

- খাদ্য বা ফিডকে সবসময় শুকনো, ঠান্ডা এবং বায়ুচলাচল করে এমন জায়গায় সংরক্ষন করতে হবে।
- চিংড়ির একটি ফিডের বা খাদ্যের বস্তার সারিতে সর্বাধিক ১০ টির বেশি রাখা যাবে না।
- সরাসরি মেঝেতে ফিডের বস্তা রাখা যাবে না, কমপক্ষে ১-২ ফুট দেওয়াল থেকে দূরে এবং উঁচুতে রাখতে হবে।
- খাদ্যের বস্তার উপর উঠে বসা যাবে না।

- একবার বস্তার মুখ খুলতে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করে নিতে হবে।
- সবসময় আগের মজুত করা খাদ্যের বস্তা আগে খালি করতে হবে।
- খাদ্যের বস্তাগুলিকে বেশি নড়াচাড়া করা যাবে না এতে খাদ্য গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- খাদ্য সংরক্ষনের জায়গায় যাতে কীট, পতঙ্গ, ইঁদুর না ঢুকতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

প্রথম ৩০ দিনের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সমস্ত রকমের জীবন্ত প্রাণী সমেত চিংড়িকেও তাদের ওজনের সমানুপাতিক ভাবে খাওয়ানো হয়। তবে কালচার বা চাষ শুরুর প্রথম ৩০ দিন দেহের ওজনে (Biomass) নির্বাচন করা খুবই কঠিন। তাই সর্বপ্রথম আন্দাজ অনুযায়ী চিংড়িকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। চিংড়ির বেঁচে থাকার হার ও তাদের গড় দেহের ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমানের অনুমান করা হয়। প্রথমে শুরুর দিকে দেহের ওজনের প্রায় সমান ওজনের খাদ্য দেওয়া হয়। প্রথম ৩০ দিনের শেষের দিকে তা কমিয়ে ধীরে ধীরে ৮-৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। যদিও বা খাদ্য উৎপাদনকারী তাদের অভিজ্ঞতা এর ওপর ভিত্তি করে খাদ্য বিতরন বা Feeding chart দিয়ে থাকেন। চাষের শুরুতে দেওয়া প্রথম ৩০ দিনের ফিডের বা খাদ্যের পরিমাণ পুরো চাষ চলাকালীন মোট ফিডের ১০ শতাংশের ও কম তাই প্রথমের দিকে ফিডের পরিমান একটু কম বেশি হলেও কোনো সমস্যা হবে না।

এই সমস্ত ফিডকে পুকুর বাঁধের পাশ বরাবর দিতে হবে কারন চিংড়ির PL বা লার্ভা গুলির খাদ্য গ্রহণের প্রবনতা অনেকটা একই রকমের। এই সময়ে যে ফিড ব্যবহার করা হয় তা অনেকটা বালির মতো চূর্ন বিচুর্ন হয় তাই ফিড গুলি বাতাসে উড়ে যাওয়ার এবং এদিক ওদিক পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাই এই সময় খাদ্যের বা ফিডের সাথে ১০-১৫ শতাংশ জল মিশিয়ে পুকুরে ছড়াতে হবে যাতে এগুলি সহজে উড়ে যেতে না পারে এবং দ্রুত ডুবে যায়।

৩০ দিন থেকে হারভেস্ট পর্যন্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনা-

প্রথম ৩০ দিনের পরবর্তী সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ির সঠিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা চিংড়ির গড় ওজন নেওয়ার পর তার উপর ভিত্তি নিশ্চিত করা হয়। ১০ দিন অন্তর অন্তর চিংড়ির স্যাম্পলিং করতে হবে এবং বায়োমাস, গড় দেহের ওজন মাপতে হবে এর ওপর ভিত্তি করে ১০ দিন অন্তর অন্তর চিংড়ির চাহিদা নির্ণয় করতে হবে। ৪-৫ বার স্যাম্পলিং করার পর আনুমানিক বেঁচে থাকার হার, মাছের সংখ্যা এবং গড় দেহের ওজন নির্ণয় করে এবং দৈনিক ফিডের চাহিদার পরিমাণ নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়-

$$\text{খাদ্যের দৈনিক চাহিদা (১০ শতাংশ)} = \frac{\text{গড় দেহের ওজন (ABW)} \times \text{মাছের সংখ্যা}}{১০০০} \times \frac{১০}{১০০}$$

এবার নির্মিত খাদ্যের পরিমাণকে ৪ টি সমান ভাগে ভাগ করে দিনে ৪ বার পুকুরে দেওয়া হয়। সারাদিনে বেশি বার খাবার দিলে বা মিলের সংখ্যা বাড়ালে যেরকম অনেক সুবিধা আছে সেরকম অনেক অসুবিধাও আছে। তবে সারাদিনে ৪-৫ বার খাবার দেওয়া আদর্শ। প্রস্তাবিত খাদ্য দেওয়ার সময় গুলি হল সকাল ৬ টা, ১০ টা এবং বিকেল ২ টা, ৬ টা এটি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যদি শীতকালের সকালের তাপমাত্রা কম হয়। অর্থাৎ ঠান্ডার পরিমান বেশি হয় তাহলে সকালের খাবার ৩০-৪৫ মিনিট দেরি করা যেতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালের বিকেলে ২ টা এবং ৬ টার খাবারের মধ্যে ১ ঘন্টা দেরি করা যেতে পারে।

প্রথম ৩০ দিনের পর প্রতিদিন চেকট্রে ফিডিং ভালো করে পর্যবেক্ষন করতে হবে। ১ হেক্টর পুকুরে কমপক্ষে ৪ টি জায়গায় চেকট্রে লাগাতে হবে এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমানের উপর ভিত্তি করে চেকট্রেতে খাওয়ার দিতে হলে প্রত্যেক মিলের সময়ে শুরুতে ০.৫ শতাংশ হারে চেকট্রেতে ফিড দিতে হবে এবং সেটিকে ২.৩০ ঘন্টা পরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এরপর চাষের দিন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ফিডের পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চিংড়ির হারভেস্টের সময় অর্থাৎ মাছের ওজন

যখন প্রায় ২৫ গ্রাম হয় তখন চেকট্রে ফিডিং এর পরিমাণ ১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এরপর ধীরে চেকট্রে দেখার সময় ২.৩০ ঘন্টা থেকে কমিয়ে কালচারের শেষের দিকে ১.৩০ ঘন্টা কমিয়ে আনতে হবে। চেকট্রে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কতটা পরিমান খাদ্য পুকুরে দেওয়া হবে তা নির্ধারন করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের পর অবশিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ	খাদ্যের পরিমান পরিবর্তনের হার
চেকট্রে তে কোন খাদ্যের দানা না পড়ে থাকলে	পরবর্তী খাবারের সময় ৫ শতাংশ খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে
অল্প খাদ্যের দানা বা প্রায় ৫ শতাংশ খাদ্য থেকে গেলে	কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই সমপরিমান খাদ্য পরবর্তী খাবারের সময় দিতে হবে
৫-১০ শতাংশ খাদ্য থেকে গেলে	পরবর্তী খাবারের সময় ৫ শতাংশ খাদ্য কমাতে হবে
১০-২০ শতাংশ খাদ্য থেকে গেলে	পরবর্তী খাবারের সময় ১০ শতাংশ খাদ্য কমাতে হবে
২০-৩০ শতাংশ খাদ্য থেকে গেলে	পরবর্তী খাবারের সময় ২০-৩০ শতাংশ খাদ্য কমাতে হবে
৩০ শতাংশ বা তার বেশি খাদ্য থেকে গেলে	পরবর্তী খাবারের সময় ফিডিং বন্ধ রাখতে হবে এবং পরবর্তী ফিডিং শুরু করলে তাতে খাদ্যের পরিমান ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিতে হবে আগের খাদ্যের পরিমানের তুলনায় এবং খাদ্য গ্রহণের হার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে

সমস্ত খাদ্য বা ফিড উৎপাদনকারীরা ফিডিং চার্ট বা নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন কিন্তু চাষীদের মাথায় রাখতে হবে শুধু নির্দেশিকা মানলেই হবে না। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের চাহিদা প্রত্যেক পুকুরে আলাদা আলাদা হয় এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমান অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। দৈনিক খাদ্যের

চাহিদা দৈনিক খাদ্যের গ্রহণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, চিংড়ির মোল্টিং (Molting) বা খোলস ত্যাগের সময়কাল, মজুত ঘনত্ব, পুকুরের প্রকৃতির খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা, মাটি এবং জলের গুণগত মান এবং পরিবেশের উপর আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। একজন চাষী পারিপার্শিক পরিবেশ এবং তার পুকুরকে ভালো ভাবে চেনে এবং চেকট্রে পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে দৈনিক খাদ্যের পরিমান নির্ণয় করা উচিত।

ভেনামি চাষে উচ্চ ঘনত্বের কারনে দৈনিক খাদ্যের চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা একজন লোকের পক্ষে সম্ভব হয় ওঠে না এবং তখন সঠিক পরিমান খাদ্য প্রদান সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। অটো ফিডার বা ফিডিং মেশিনের ব্যবহারের অনেক সুবিধা এবং উপকারী দিকও আছে যেমন এটি সময় বাঁচায়, বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, FCR, জল এবং মাটির গুণগতমান বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফিডিং মেশিনের ব্যাবহার করে ফিড বা খাদ্য ছড়ালে FCR এর পরিমান ০.১-০.১৫ কম আসে। বর্তমানে ভেনামি চিংড়ি চাষে ফিডিং এর হার বৃদ্ধির সাথে সাথে ফিডিং মেশিনের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সাধারনত একটি অটো ফিডার মেশিন একটি ১ হেক্টর পুকুরে খাবার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

উপরিউক্ত সঠিক খাদ্য ব্যাবস্থাপনায় এবং সঠিক পরিচালন ব্যাবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে চাষীরা তাদের লাভের পরিমান বৃদ্ধি করতে পারবে।

চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত গুন বিশিষ্ট জলের ব্যবস্থাপনা

আর. সরস্বতী, এম. মুরলিধর, জোস অ্যান্টনি, পি. কুমারারাজা এবং মৌমিতা আশ

আমরা জানি, যেকোনো প্রাণীর বাঁচার জন্য জল কতটা জরুরি। চিংড়ির ক্ষেত্রেও এই কথাটা খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু শুধু জল হলেই তো হবে না, সেই জলের গুণমানও হতে হবে চিংড়ির জন্য উপযুক্ত।চিংড়ি খুবই সংবেদনশীল মাছ। জলের সামান্যতম পরিবর্তন তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, জলের গুণমান ঠিক রাখা।চিংড়ি চাষের জন্য সবার আগে দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালো মানের জলের উৎস। সমুদ্রের জল, অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের লবণাক্ত ভূগর্ভস্থ জল, খাড়ি, হ্রদ, মোহনা এবং এমনকি কখনও কখনও ক্ষেতের মিষ্টি জল জলও ব্যবহার করা যেতে পারে চিংড়ি চাষের জন্য। তবে জল যাই হোক না কেন, তার লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, ক্ষারত্ব, অক্সিজেনের পরিমাণ সবকিছুই হতে হবে চিংড়ির জন্য।শুধু তাই নয়, জলে অ্যামোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কারণ এসব পদার্থ চিংড়ির জন্য মারাত্মক হতে পারে। মোটকথা, চিংড়ি চাষে সাফল্য পেতে হলে জলের যত্ন এবং গুণমান বজায় রাখা অপরিহার্য।

চিংড়ি চাষের জন্য জল পরিশোধনের ব্যবস্থা

চিংড়ি চাষের সাফল্য নির্ভর করে অনেকাংশেই জলের গুণগত মানের উপর। সুস্থ এবং সবল চিংড়ি পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র পুকুর খনন করলেই হবে না, বরং পুকুরের জল পরিশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে যদি উৎসের জল মোটামুটি পরিষ্কার থাকে, তাহলে জলাধারে ভরাট করার পর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করলেই হয়। কিন্তু জল যদি খুব ঘোলাটে হয়, তাহলে তাকে ছেঁকে নিতে হবে। এই ছেঁকে নেওয়ার কাজটা করা হয় বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম জাল দিয়ে (৬০ মাইক্রন ফিল্টার) এই জালগুলো এতটাই সূক্ষ্ম যে, তা দিয়ে রোগজীবাণু বহনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীও ঢুকতে পারে না। এরপর জলে ক্লোরিন মেশানো হয় জীবাণু ধ্বংস করার জন্য। কতটা ক্লোরিন মেশাতে হবে, তা নির্ভর করে জলের পিএইচ, জৈব পদার্থের ঘনত্ব এবং অ্যামোনিয়ার উপর নির্ভর করে ক্লোরিন (৩০ পিপিএম) মেশানোর পর অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত ক্লোরিন জলে থেকে না যায়। কারণ এতে চিংড়ির ক্ষতি হতে পারে। চিংড়ি ছাড়ার আগে ক্লোরিনের অবশিষ্টাংশ ০.০০১ পিপিএম এর কম হওয়া উচিত। অতিরিক্ত ক্লোরিন দূর করার জন্য জলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়, সোডিয়াম থায়োসালফেট মেশাতে হয়, এমনকি রোদে জলকে কিছুক্ষণ রাখা হয়। যদি জলে অনেক বেশি কাদা থাকে, তাহলে তাকে আলাদা একটি পুকুরে পাম্প করা হয় এবং দু-তিন দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয় । কাদা পরিষ্কার করার জন্য পলি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। ৩০০-৫০০ এনটিইউ কাদামাটির ঘোলাটে উৎস জলের জন্য, ৩-৭ পিপিএম ঘনত্বের সাথে পলি

অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড (পিএসি) প্রয়োগ করা হয়। জৈব পদার্থ কমাতে, ১-২ পিপিএম ঘনত্বে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যোগ করা হয়। এভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে চিংড়ির জন্য সুস্থ এবং নিরাপদ পুকুর তৈরি করা হয়।

চিংড়ি পুকুরে শুধু জল পরিশোধন করলেই হবে না, তাকে তৈরি করতে হবে চিংড়ির চাষের উপযোগী করে। আর এই কাজেই সাহায্য করে সার। চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রথমে ৩০-৪০ সেমি পর্যন্ত জল ভরা হয় এবং কয়েকদিন তা স্থির থাকতে দেওয়া হয়। এই সময় পুকুরে জন্মায় প্রচুর শ্যাওলা, যা চিংড়ির খাবারের উৎস। এই সময়ের মধ্যে, জলের রঙ শ্যাওলা জন্মানোর ফলে গাঢ় সবুজ হয়ে যেতে পারে। কতটা সার দেওয়া হবে, তা নির্ভর করে পুকুরের জলের অবস্থার এবং শ্যাওলা উৎপাদনের উপর। এরপর অল্প পরিমাণে জৈব (পচা চালের কুঁড়ো বা পচা জৈব রস) এবং অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়। এরপর জলের স্তর ১০০-১২৫ সেমি পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং এক সপ্তাহ পরে চিংড়ি ছাড়া হয়। এরপর আসে জলের গুণমান পরীক্ষা করার পালা। জলের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, মোট ক্ষারত্ব, খনিজ, পুষ্টি এবং উপজাত পদার্থ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা, তা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হয়।

জলের পিএইচ:

চিংড়ির জন্য জলের পিএইচ এর মাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোত্তম পিএইচ মাত্রা ৭.৫-৮.৫ এবং পিএইচ-এর দৈনিক পরিবর্তন ০.৫ এর মধ্যে হওয়া উচিত। বিকেলে পিএইচ-এর পার্থক্য ০.৩ ছাড়িয়ে গেলে পিএইচ বাড়ানোর জন্য ১৮০-৩০০ কেজি প্রতি হেক্টর হারে ২-৩ দিনের জন্য ডলোমাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। বিকেলে পিএইচ-এর পার্থক্য ০.৫ পৌঁছালে ১৮০-৩০০ কেজি প্রতি হেক্টর হারে কৃষি চুন ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন জলের পিএইচ ৮.৩ ছাড়িয়ে যায়, তখন জল বিনিময়, উপযুক্ত প্রোবায়োটিক ব্যবহার এবং ১০-৩০ কেজি প্রতি হেক্টর হারে গাঁজানো রস (Fermented juice) ব্যবহার করে এটি কমানো যেতে পারে। মাটির তৈরি পুকুর এবং প্লাস্টিকের আস্তরণযুক্ত পুকুরের মধ্যে তুলনামূলক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে প্লাস্টিকের আস্তরণযুক্ত পুকুরের তুলনায় মাটির তৈরি পুকুরে পিএইচ-এর তারতম্য কম হয় কারণ মাটির পিএইচ-এর ব্যাপক তারতম্যের বিরুদ্ধে বাফার হিসেবে কাজ করে। আরেকটি কারণ হতে পারে প্লাস্টিকের আস্তরণযুক্ত পুকুরের তুলনায় মাটির তৈরি পুকুরে বেশি ক্ষারত্ব।

লবণাক্ততা:

জলে কতটা লবণ আছে, তাকেই বলা হয় লবণাক্ততা। সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে, আর নদীর জলে কম। চিংড়ির জন্য ১০ থেকে ৩৫ পিপিটি লবণাক্ততা সবচেয়ে ভালো। তবে কোন

প্রজাতির চিংড়ি, তার উপর নির্ভর করে লবণাক্ততার তারতম্য হতে পারে। মোটকথা চিংড়ি চাষে সফলতা পেতে হলে জলের গুণমানের দিকে সবসময় নজর রাখতে হবে। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ, পিএইচ এবং লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ - এই সবকিছু মিলেই তৈরি হয় চিংড়ির চাষের উপযোগী পরিবেশ।

তাপমাত্রা:

পুকুরের জলের তাপমাত্রা চিংড়ির খাওয়া-দাওয়া, শরীরের কাজকর্ম, এমনকি বেঁচে থাকার জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে, চিংড়ির শরীরের ভেতরের সব কাজকর্ম দ্বিগুণ গতিতে হতে থাকে। ফলে তাদের বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। চিংড়ি চাষের জন্য জলের তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা ভালো। বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা, দুটোতেই চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যার ফলে তারা রোগের প্রতি আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।আচ্ছা, পুকুর যদি প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া হয়, তাহলে কি জলের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়? না, আসলে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। কারণ যান্ত্রিক বায়ুযন্ত্র পুকুরের জল সবসময় সঞ্চালিত করে, ফলে তাপমাত্রা সর্বত্র একই থাকে।

ঘোলাটে ভাব:

কখনো কি লক্ষ্য করেছেন, পুকুরের জল কখনো পরিষ্কার থাকে, আবার কখনো ঘোলাটে দেখায়? এই ঘোলাটে ভাব আসলে জলে থাকা ছোট ছোট কণার জন্য হয়। কিন্তু সব ঘোলাটে ভাব খারাপ নয়। প্লাঙ্কটনের জন্য যে ঘোলাটে ভাব হয়, তা আসলে ভালো। কারণ প্লাঙ্কটন হলো চিংড়ির প্রিয় খাবার। অন্যদিকে, মাটির কারণে যদি জল ঘোলাটে হয়, তাহলে চিন্তার বিষয়। কারণ এতে জলের গুণ নষ্ট হতে পারে। জল কতটা ঘোলাটে, তা পরিমাপ করার জন্য "সেচি ডিস্ক" নামের একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। চিংড়ি চাষের জন্য জলের স্বচ্ছতা ২৫-৫০ সেমি হওয়া ভালো। যদি জল বেশি পরিষ্কার থাকে (স্বচ্ছতা >৬০ সেমি), তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে প্লাঙ্কটনের অভাব । তখন পুকুরে সার দিতে হবে। আর যদি জল অনেক বেশি ঘোলাটে হয় (স্বচ্ছতা <২০ সেমি), তাহলে সার দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। মাটির কারণে ঘোলাটে ভাব দূর করার জন্য অ্যালুম এবং ফেরিক সালফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যালুম আর জিপসাম যখন পুকুরের জলে ব্যবহার করা হয়, তখন জলের "পিএইচ" এবং "ক্ষারত্ব" কমে যেতে পারে। এটা চিংড়ির জন্য ভালো নয়। তাই সাথে সাথে চুন ব্যবহার করলে জলের "পিএইচ" ঠিক থাকে।

দ্রবীভূত অক্সিজেন:

আমাদের যেমন বাতাস ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না, চিংড়িরও তেমনি জলের মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া চলা অসম্ভব। এই অক্সিজেনই তাদের জীবন বাঁচায়। এই অক্সিজেন আসে কোথা থেকে? জলে থাকে

কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এদের নাম ফাইটোপ্লাঙ্কটন। এরা সূর্যের আলো ব্যবহার করে যেমন নিজেদের খাবার তৈরি করে, তেমনি জলে অক্সিজেন ছাড়ে। কিন্তু অনেক সময় প্রবল বৃষ্টি হলে অথবা পুষ্টির অভাবে এই ফাইটোপ্লাঙ্কটন কমে যেতে পারে। ফলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং চিংড়ির শ্বাসকষ্ট হতে পারে।চিংড়ির ভালো থাকার জন্য জলে অক্সিজেনের পরিমাণ ৪ থেকে ১০ পিপিএম এর মধ্যে থাকা জরুরি। এই পরিমাণে জলে বিষাক্ত পদার্থ, যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, কম হয়। আর জলে অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি? পুকুরের জল বদলে দিতে পারি। আবার "বায়ুযন্ত্র" ব্যবহার করে জোর করে জলে অক্সিজেন মিশিয়ে দিতে পারি। "প্যাডেলহুইল" নামের এক ধরণের বায়ুযন্ত্র খুব ভালো কাজ করে।

সাধারণত প্রতি ৫০০ কেজি চিংড়ির জন্য এক হর্সপাওয়ার ক্ষমতার বায়ুযন্ত্র দরকার হয়।

খনিজ: চিংড়ির শরীর গঠনের উপাদান

আমাদের যেমন শরীর গঠনের জন্য লবণ, জল, খনিজ দরকার হয়, ঠিক তেমনি চিংড়ির জন্যও কিছু খনিজ খুবই জরুরি। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম - এই সব খনিজ তাদের সুস্থ থাকা এবং বড় হওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।এই খনিজগুলো যেন জলে ঠিক পরিমাণে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সমুদ্রের জলে যে পরিমাণে এই খনিজগুলো থাকে, চিংড়ি পুকুরের জলেও যেন প্রায় সেই পরিমাণে থাকে। এবার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ঠিক কত পরিমাণে কোন খনিজ দরকার? জলের লবণাক্ততা দেখে সহজেই বোঝা যাবে কোন খনিজের পরিমাণ কত হওয়া উচিত। নিচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে, জলের লবণাক্ততা ভেদে কোন খনিজের পরিমাণ কত হওয়া উচিত:

খনিজ (পিপিএম)	লবণাক্ততা		
	১ পিপিটি	৫ পিপিটি	১০ পিপিটি
ক্যালসিয়াম	১১.৬	৫৮.০	১১৬.০
ম্যাগনেসিয়াম	৩৯.১	১৯৫.৫	৩৯১.০
পটাশিয়াম	১০.৭	৫৩.৫	১০৭.০
সোডিয়াম	৩০৪.৫	১,৫২২.৫	৩,০৪৫.০

যদি কোনো কারণে কোন খনিজের ঘাটতি হয়ে যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। বাজারে এর জন্য অনেক ধরণের লবণ পাওয়া যায়। যেমন - ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (কে ম্যাগ), হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (এপসম) ।এবার কথা হলো, ঠিক কতটুকু লবণ দিলে হবে? এর জন্যও একটা সহজ সূত্র আছে।

$$\text{প্রয়োজনীয় লবনের পরিমান} = \frac{\text{খনিজের পরিমান (পিপিএম)}}{\text{লবনে খনিজের শতাংশ}}$$

ধরুন, আপনার পুকুরের জলে পটাশিয়াম ২০০ পিপিএম করতে চান। আর পটাশিয়াম ক্লোরাইডে পটাশিয়াম থাকে ৫০%। তাহলে আপনাকে (২০০/৫০)×১০০=৪০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রতি লিটার জলে দিতে হবে।

ব্যাস, এই ছোট্ট হিসাব মনে রাখলেই চিংড়ির খনিজের চাহিদা পূরণ করা খুব সহজ হয়ে যাবে।

পুকুরের জলের ক্ষারত্ব

ক্ষারত্ব হলো পুকুরের জলের অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা, সহজ ভাষায়, জলে কতটুকু ক্ষার (যেমন- বাইকার্বনেট, কার্বনেট, ফসফেট, হাইড্রোক্সাইড) আছে, তারই একটা পরিমাপ হলো ক্ষারত্ব।এবার প্রশ্ন হলো, কতটুকু ক্ষারত্ব হলে চিংড়ির জন্য ভালো? কোন প্রজাতির চিংড়ি এবং চাষের কত দিন হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে জলে ক্ষারত্বের পরিমাণ কত হওয়া উচিত। ছোট্ট চিংড়ির তুলনায় বড় চিংড়ির জন্য বেশি ক্ষারত্ব দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাগদা চিংড়ির তুলনায় গলদা চিংড়ির জন্য প্রায় ২০ পিপিএম বেশি ক্ষারত্বের প্রয়োজন হয়।মাটির পুকুরের তুলনায় লাইন করা পুকুরে ক্ষারত্ব কম থাকে। কারণ লাইন করা পুকুরে জল পরিবর্তন কম হয় এবং মাটি থেকে খনিজ মিশে ক্ষারত্ব তৈরি হতে পারে না।সাধারণত ৭৫ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার ক্ষারত্ব চিংড়ি পুকুরের জন্য উত্তম। ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করতে ডলোমাইট, এবং জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।তবে অনেক সময় নলকূপের জলে ক্ষারত্ব বেশি থাকে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম বাইসালফেট ব্যবহার করে ক্ষারত্ব কমানো যেতে পারে।

পুষ্টি উপাদান

প্ল্যাঙ্কটনের জন্য দরকার হয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, কার্বন আরও নানান পুষ্টি উপাদান। এই পুষ্টি পেলে প্ল্যাঙ্কটন তাড়াতাড়ি বড় হয়। নাইট্রেট আর ফসফেট যেন তাদের প্রিয় খাবার! যত বেশি নাইট্রেট-ফসফেট, তত বেশি প্ল্যাঙ্কটন। তাই পুকুরে সার দেওয়া হয় যাতে নাইট্রেট-ফসফেটের ১৫:৩০ পরিমাণ বাড়ে। আর পুকুরের তলায় যেন কোনো বিষাক্ত পদার্থ তৈরি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। তবে পুকুরের জলতে লবণের পরিমাণ আর নাইট্রোজেন-ফসফরাসের অনুপাতের তারতম্য হলে প্ল্যাঙ্কটনের প্রকারেরও পরিবর্তন হতে পারে।

বিপাকজাত পদার্থ

চিংড়ি চাষে প্রধান বিপাকজাত পদার্থগুলি হল অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট এবং সালফাইড।

অ্যামোনিয়া

প্রাণীদের বিপাক এবং অবশিষ্ট খাদ্য, মল, মৃত প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদির মতো জৈব পদার্থের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনের ফলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। জলে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন দুটি আকারে থাকে, অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন। অ্যামোনিয়ার অনুপাত পিএইচ, তাপমাত্রা এবং কিছুটা লবণাক্ততার উপর নির্ভর করে। কোষের পর্দা জুড়ে সহজেই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতার কারণে অ-আয়নিত অ্যামোনিয়াকে অধিক বিষাক্ত রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই এর পরিমাণ 0. ১ পিপিএম এর কম হওয়া উচিত।

তাই পুকুরের জলতে এই বিষাক্ত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কম রাখা খুবই জরুরি। এর জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারেঃ

- জল পরিবর্তনঃ নিয়মিত ৩০-৫০% জল বদলে দিলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমে।
- জলর পিএইচ কমানোঃ জলর পিএইচ কমালেও বিষাক্ত অ্যামোনিয়া কমে।
- খাবারের পরিমাণ কমানোঃ অতিরিক্ত খাবার জলতে পচে অ্যামোনিয়া তৈরি করে।
- শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণঃ পুকুরে অতিরিক্ত শ্যাওলা জন্মালে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পর্যাপ্ত অক্সিজেনঃ জলতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকলে উপকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে, যা কম ক্ষতিকর।
- চুনাপাথরঃ জলতে চুনাপাথর মিশালেও অ্যামোনিয়ার মাত্রা কমে।
- কার্বন জাতীয় পদার্থঃ এই ধরণের পদার্থ পুকুরে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি করে, যা অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

নাইট্রাইট

চিংড়ির পুকুরে নাইট্রাইট এক ধরণের বর্জ্য পদার্থ যা জলতে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপের মাধ্যমে তৈরি হয়। তবে, গ্রীষ্মকালে পুকুরে নাইট্রাইটের পরিমাণ সাধারণত খুবই কম থাকে (০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটারেরও কম)। কারণ, এই সময় পুকুরে থাকা plankton খুব দ্রুত অ্যামোনিয়া (ammonia) শোষণ করে।জলর পিএইচ বেশি হলে নাইট্রাইটের বিষাক্ততা বেড়ে যায়। আবার, জলতে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরাইড থাকলে নাইট্রাইটের বিষক্রিয়া কমে। চিংড়ির জন্য নাইট্রাইটের সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা হল ০.২ মিলিগ্রাম/লিটার।

হাইড্রোজেন সালফাইড

পুকুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন নিশ্চিত করা, সঠিক মাত্রায় সার ও খাবার প্রয়োগ এবং জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে জলতে নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে, পুকুরে যখন পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে না, তখন কিছু ব্যাকটেরিয়া জলতে থাকা সালফেট ব্যবহার করে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) তৈরি করে। এই H_2S চিংড়ির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। জলর পিএইচ, তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা হাইড্রোজেন সালফাইড এর বিষক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে, জলর পিএইচ এর উপর হাইড্রোজেন সালফাইড এর বিষক্রিয়া বেশি নির্ভরশীল। সাধারণত পুকুরের তলদেশে যেখানে কম অক্সিজেন থাকে, সেখানে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি হয়। পুকুরের জলতে যদি আয়রনের পরিমাণ কম থাকে এবং পিএইচ ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকে, তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। চিংড়ির জন্য হাইড্রোজেন সালফাইড এর সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা হল ০.০০৩ মিলিগ্রাম/লিটার। ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার এর বেশি হাইড্রোজেন সালফাইড চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য মারাত্মক হতে পারে। পুকুরে পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন, নিয়মিত জল পরিবর্তন এবং জলর সঠিক সঞ্চালনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন সালফাইড কমানো সম্ভব।এছাড়াও, নিয়মিত পুকুর শুকিয়ে পরিষ্কার করলে এবং রোদে শুকাতে দিলে পুকুরের তলদেশে জমা হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হয়ে ক্ষতিকারক পদার্থে পরিণত হয়। চিংড়ি যাতে সুস্থ থাকে, তার জন্য পুকুরের পরিবেশ নিরাপদ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক.

কম লবণাক্ত জলেও চিংড়ি চাষ? হ্যাঁ, সম্ভব!

আজকাল পৃথিবীজুড়েই কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ, বেশিরভাগ চিংড়িই মিষ্টি ও নোনা - দুই ধরণের জলেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই কম লবণাক্ত জলেও তারা বেঁচে থাকে, বড় হয় আর আমাদের খাবার টেবিলে স্থান পায়।

সাধারণত, যে জলে লবণের পরিমাণ ১৫ পি পি টি-এর কম, সেটাকেই কম লবণাক্ত জল বলা হয়। এই ক্ষেত্রে, "ভ্যাননামেই" নামের চিংড়ি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। কারণ, এরা অদ্ভুত ভাবে কম লবণাক্ত জলের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এবং খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি বাণিজ্যিকভাবে ২.৫ থেকে ৫০ পি পি টি পর্যন্ত লবণাক্ততায় চাষ করা যেতে পারে। তবে, অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি চাষ করাও অসম্ভব নয়।

কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষের জন্য কিছু বিষয় মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

- জলে কি কি ধরণের লবণ আছে এবং তাদের পরিমাণ কত, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

- ছোট চিংড়িগুলো যাতে কম লবণাক্ত জলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সেজন্য ধাপে ধাপে তাদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।
- কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, যেমন - রোগ-বালাই। তাই সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা জরুরি।

কম লবণাক্ত জল: চিংড়ির জন্য কতটা উপযুক্ত?

চিংড়ির খামার তৈরির সময় জলের উৎস সম্পর্কে সচেতন থাকা খুবই জরুরি। সমুদ্রের জল নাকি স্থলভাগের জল ব্যবহার করবো, সেটা ভেবে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, জলের উৎসের উপর নির্ভর করে তার লবণাক্ততা এবং বিভিন্ন ধরণের লবণের পরিমাণ। চিংড়ির সুস্থতা এবং বৃদ্ধির জন্য জলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়াম থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি লবণের মধ্যে ভারসাম্য থাকাটাও জরুরি। সমুদ্রের জলে প্রাকৃতিকভাবেই এই ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই চিংড়ি চাষের জন্য সমুদ্রের জল তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত। অন্যদিকে, স্থলভাগের জলে প্রায়ই পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা যায়। আবার, অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের কারণে জল "কঠিন" হয়ে যেতে পারে, যা চিংড়ির জন্য সবসময় উপযুক্ত নয়। তবে, এই সমস্যারও সমাধান আছে! স্থলভাগের জলে যদি কোন লবণের ঘাটতি থাকে, তবে আমরা খনিজ লবণ ব্যবহার করে তা পূরণ করতে পারি। যেমন, পটাশিয়ামের জন্য মিউরেট অফ পটাশ, ম্যাগনেসিয়ামের জন্য ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে, যদি কোন স্থানের কম লবণাক্ত জলে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়, তবে তা অ্যানহাইড্রাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা ফিউজড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করে পরিপূর্ণ করা যেতে পারে। কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষের জন্য প্রস্তাবিত ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের অনুপাত হলো ২:১ এবং সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের অনুপাত ২৮:১ থেকে ৪৫:১ এর মধ্যে রাখা যেতে পারে।চিংড়ি চাষের জন্য জলের লবণাক্ততা এবং আয়নিক গঠন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট্ট চিংড়ির কম লবণাক্ত জলে মানিয়ে নেওয়া

যখন আমরা কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষ করি, তখন পোনাগুলোর জন্য নতুন এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় "অভ্যস্তকরণ"। খুব ছোট্ট পোনা, যাদের বয়স মাত্র ৬-৮ দিন, তাদের জন্য একবারেই খুব কম লবণাক্ত জলে রাখা ঠিক নয়। তাদের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ পি পি টি লবণাক্ত জল উপযুক্ত। ১০-১২ দিনের পোনা অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল। তাদের ১০ পি পি টি থেকে ৪ পি পি টি পর্যন্ত লবণাক্ত জলে অভ্যস্ত করা যেতে পারে। তবে, ৪ পি পি টি এর কম লবণাক্ত জলের জন্য সবসময় ১৫ দিন বা তার বেশি

বয়সী পোনা ব্যবহার করা উচিত। বেশিরভাগ হ্যাচারি চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী কম লবণাক্ততায় পোনা সরবরাহ করে। তবে, চাষিদের উচিত পোনার বয়স ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া।পোনার জন্য নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের ধাপে ধাপে অভ্যস্ত করতে হবে, যাতে তারা সুস্থ থাকে এবং ভালো ভাবে বৃদ্ধি পায়।

কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষ: চ্যালেঞ্জ আর সমাধানের খোঁজে

আমরা জানি ভেনামি চিংড়ি কম লবণাক্ত জলেও বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি ১.০ পিপিটি লবণাক্ততায়! তবে এই ধরণের চাষ অনেকটা চ্যালেঞ্জিং। এর জন্য চাষির অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার পাশাপাশি জলের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে আয়নিক উপাদানের নিয়মিত পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।কারণ, এই পরিবেশে চিংড়ির রোগ বা মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই অনেক সময় এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সবদিক বিবেচনা করে, ৪-৫ পিপিটি এর বেশি লবণাক্ত জলে ভেনামি চিংড়ি চাষ করাই বেশি লাভজনক। এতে জলের আয়নিক উপাদান নিয়ে তুলনামূলক কম চিন্তা করতে হয়।তবে এই চাষেও কিছু সাধারণ সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন রোগ, আকস্মিক মৃত্যু, বৃদ্ধির হ্রাস, বেঁচে থাকার হার কমে যাওয়া ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।কিন্তু কম লবণাক্ত জলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিশেষ সমস্যা রয়েছে, যা জলের আয়নিক উপাদানের কারণে হয়ে থাকে।

এই সমস্যাগুলো হলো:

- মাংসপেশী বা সারা শরীরে ব্যথা
- মাংসপেশীর রঙ সাদা হয়ে যাওয়া
- খোলস ছাড়াতে সমস্যা
- খোলস ছাড়ার পর সুস্থ হতে দেরি হওয়া
- খোলস কঠিন হতে দেরি হওয়া

এই সমস্যাগুলোর জন্য কিছু প্রতিকার রয়েছে:

- চিংড়ির মাংসপেশী সাদা হয়ে গেলে, জলে পটাশিয়াম প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়া আবারও করতে হবে।
- হঠাৎ আঘাত বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে যদি মাংসপেশী ব্যথা না হয়, তবে পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম লবণ প্রয়োগ এবং জলে ম্যাগনেসিয়াম / ক্যালসিয়াম অনুপাত সংশোধন করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

- ১৫ পি পি টি এর কম লবণাক্ততায় চাষের ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে খনিজ মিশ্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং মাত্রা পোনার ঘনত্বের উপর নির্ভর করবে।

চিংড়ি চাষে সাফল্য: জলের গুণমানই হোক মূলমন্ত্র!

চিংড়ি চাষে ভালো ফল পেতে হলে জলের গুণমান সবসময় নজরে রাখতে হবে। মনে রাখবেন, শুধু জল দেখলেই হবে না, তার গুণগত মান সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এর জন্য নিয়মিত জল পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের বিভিন্ন স্তর থেকে, বিশেষ করে জলের উপরিতল এবং পলির কাছাকাছি থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। এরপর সঠিক পরীক্ষার মাধ্যমে জলের গুণগত মান যাচাই করে নেবেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে জৈব এবং রাসায়নিক উভয় ধরণের উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখবেন, পুকুরের পরিবেশ যত ভালো রাখবেন, চিংড়ির সুস্থ বৃদ্ধি তত বেশি হবে। তাই পুকুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ক্ষতিকারক জিনিস পুকুরে না ফেলা, এবং নিয়মিত জল পরিবর্তন করার মাধ্যমে চিংড়ির জন্য একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করুন। এতে আপনার চিংড়ি চাষ হবে লাভজনক এবং সাফল্যমন্ডিত।

চিংড়ির রোগ হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক মাইক্রোস্পোরিডিওসিস এবং (এইচপিএম) হোয়াইট ফিকাল সিন্ড্রোম (ডব্লিউএফএস)

টি. সতীশ কুমার, আর. আনন্দরাজা, সঞ্জয় দাস, এন. এস. সুধীর এবং কে. পি. জিতেন্দ্রন

ভূমিকা

চিংড়ি চাষ হল এফটি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনকারী ক্ষেত্র এবং এই চিংড়ি চাষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ন। বিশ্বে মোট চিংড়ি ও অন্যান্য কবচী প্রজাতির মোট উৎপাদন হয় ৯.২ মিলিয়ন টন এবং মোট রপ্তানি মূল্যের ২৩% আসে এই চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য কবচী প্রাণী থেকে (FAO, 2022)। সামুদ্রিক চিংড়ি উপকূলীয় মাছ ও ক্রাস্টেসিয়ান উৎপাদনে অধিপত্য বিস্তার করে। বর্তমানে চিংড়ি চাষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি *পিনিয়াস ভেনামি*-র উৎপাদন হলো ৫৭.৪১ মিলিয়ন টন যা মোট চিংড়ি উৎপাদনের ৫১.৭ শতাংশ (FAO, 2022)। ভারতে প্রথমে ভেরি এবং পোক্কালি ক্ষেতে চিরাচরিত প্রথার চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে চিংড়ির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বানিজ্যিক হিসাবে চাষ শুরু হয়। ২০২২ সালের ভারত থেকে রপ্তানি করা মোট সমুদ্রজাত খাদ্যের পরিমান ছিল ৩৫,২৮৬ টন যার ভারতীয় মূল্য ৬৩,৯৬৯.১৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে হিমারিত চিংড়ির মূল্য ৪৩,১৩৫.৫৪ কোটি টাকা। ভারতে প্রধানত *পি. ভেনামি, পি. মনোডন* ও *ম্যাক্রোব্র্যাচিয়াম রোজেনবার্গি* এই তিন প্রকারের চিংড়ি মোট ৮,৪৩,৬৩৩ টন উৎপাদন হয়। এর মধ্যে সবথেকে বেশি চাষ হয় *পি. ভেনামি* প্রজাতির চিংড়ির। ভারতে মোট চাষের ১,০৮,৫২৬.২৭ হেক্টর জমিতে *পি. ভেনামি* এবং ৫৮,১৯৬ হেক্টর জমিতে *পি. মনোডন* চাষ হয়। চিংড়ি চাষের চিংড়ির বৃদ্ধি এবং চিংড়ির বেঁচে থাকা মূল বাধা হল রোগ এবং এই বিভিন্ন রোগের কারণে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাহত হয়। সারা পৃথিবীতে ভাইরাস রোগ যেমন হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (ডব্লিউএসএসভি), মনোডন ব্যাকুলোভাইরাস (এমবিভি) হেপাটোপয়েটিক নেক্রোসিস ভাইরাস (আইএইচএইচএনভি), ইয়েলোহেড ভাইরাস (ওয়াইএইচভি), সংক্রামক মায়োনেক্রোসিস ভাইরাস (আইএমএনভি) এবং Taura সিনড্রোম ভাইরাস (টিএসভি) এর ফলে চিংড়ি মৃত্যু এবং প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। ভারতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে WSSV, IHHNV, এবং IMNV এর মতো ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। চিংড়ি চাষের সবচেয়ে ক্ষতি কারক রোগ হোয়াইট স্পট রোগ (ডব্লিউএসভি) এবং এই রোগ হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস (ডব্লিউএসএসভি) দ্বারা সৃষ্টি হয়। ২০১৮-১৯ সালে WSSV এর কারণে চিংড়ি চাষে আনুমানিক আমাদের দেশে প্রায় ১,৬৭০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। সংক্রামক মায়োনেক্রোসিস (IMN) রোগটি আইএমএনভি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ঠ ভারতে আগত নতুন রোগ। বর্তমানে *এন্টারোসাইটোজুন হেপাটোপেনাই* (EHP) নামক পরজীবী দ্বারা সৃষ্টি হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক মাইক্রোস্করিডিওসিস (HPM) রোগটি চিংড়ি চাষ

করা দেশ গুলিতে মারাত্মক ক্ষতি করছে। ২০১৮-১৯ সালে ভারতের চিংড়ি চাষে EHP পরজীবি দ্বারা চিংড়ির ক্ষতির পরিমান ৩,৯৭৭ কোটি টাকা। এছাড়াও চিংড়ি হ্যাচারি, এবং চিংড়ি প্রতিপালনে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ, ভিব্রিয়োসিস, ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়া রোগ এবং লুমিনেসেন্ট ব্যাকটেরিয়া রোগের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে। বর্তমানে অ্যাকিউট হেপাপ্যানক্রিয়টিক নেক্রোসিস ডিজিজ (AHPND) বা আরলি মর্টালিটি সিন্ডোম (EMS) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলিতে চিংড়ি উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি করছে। কিন্তু ভারতে AHPND রোগের উপস্থিতি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি। চিংড়ির উপরোক্ত গুলি ছাড়াও আর কিছু সমস্যা আছে সেগুলি হল রানিং মর্টালিটি সিন্ড্রোম (RMS), হোয়াইট ফিকাল সিন্ড্রোম (WFS), হোয়াইট মাসল সিন্ড্রোম (WMS) এবং ব্ল্যাক গিল ডিডিজ ইত্যাদি দেখা যায়। এই রোগ গুলি ব্যাতিত চিংড়ির কিছু অজানা রোগ আছে সেগুলি চিংড়ির মৃত্যুর হার বড়িয়ে দেয় এবং চিংড়ির বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে, সেই রোগের কারণেও চিংড়ি চাষে চাষীদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। *এনটারোসাইটোজুন হেপাটোপিনাই* (EHP) পরজীবী এবং অজানা ইটিওলজি সহ WFS সিন্ড্রোম যা চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক কে মারাত্মক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ করেছে।

হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক মাইক্রোস্পরিডিওসিস (এইচপিএম)

হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক মাইক্রোস্টরিডিওসিস (HPM) রোগটি সৃষ্টি হয় এন্টেরাসাইজুন হেপারোপিনাই (EHP) নামক পরজীবি থেকে। ২০০৯ সালে থাইল্যান্ডের বাগদা চিংড়ি চাষে এই রোগ সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল। তার পর থেকে এই মাইক্রোস্পরিডিয়ান পরজীবি দ্বারা সৃষ্ট রোগ ভারত সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেহেতু এই পরজীবীটি চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের (HP) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাই এই রোগটিকে হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক মাইক্রোস্পরিডিওসিস বলা হয়।

EHP এর ফলে চিংডির সরাসরি মৃত্যু হয় না, তবে চিংড়ির বৃদ্ধি কমে যায় এবং WFS সিন্ডোম দেখা যায়। EHP হলে FCR বৃদ্ধি পায়, চিংড়ির উৎপাদন খরচ বেশী হয় এবং চিংড়ি চাষে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

হোস্ট পরিসীমা, বিতরণ এবং ব্যাপকতা

বর্তমানে মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, ভেনিজুয়েনা, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত সহ বিভিন্ন চিংড়ি চাষের দেশে EHP পরজীবী ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলেই EHP পরজীবীর বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। EHP এর সহ সংক্রমন অনান্য ভাইরাল রোগ মেমন WSSV, IMNV, TSV, HPV এর ব্যাকটেরিয়াল রোগ AHPND এবং ভিব্রিওসিসি রোগের

সাথে দেখা গেছে। এই মাইক্রোস্পরিডিয়ান পরজীবী বাগদা, ভেনামি চিংড়ি, চাপড়া চিংড়ি এবং বেনানা চিংড়ির (*পি. মারগুয়েনসিস*) রোগ সৃষ্টি করে বলে জানা গেছে। কিছু অমেরুদন্ডী প্রানী যেমন পলিকিট পোকা, আর্টেমিয়া, বন্য কাঁকড়া, ছোট জলজ শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি চিংড়ির এই রোগ বহন করে।

ক্লিনিকাল লক্ষন

চিংড়ি যখন ছোটো থাকে তার মধ্যে EHP সংক্রমনের কোনো লক্ষন দেখা যায় না। কিন্তু যখন চিংড়ি বড় হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে বৃদ্ধির তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। EHP এর ফলে চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াস আক্রান্ত হয়, বিপাক্রিয়াতে সমস্যা হয় এবং চিংড়ির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। EHP সংক্রমনের ফলে চিংড়ির ফিড কনভারসান রেশিও (FCR) বেড়ে যায়, খাদ্যানালী খালি থাকে এবং চিংড়ি দুর্বল ও নরম খোলসে পরিণত হয়। EHP সংক্রমণের ফলে একসঙ্গে চিংড়ির মৃত্যু হয় না কিন্তু প্রতি দিন কিছু কিছু করে চিংড়ি মরতে থাকে। এই সংক্রমণ বেশি দিন থাকলে চিংড়ির মধ্যে WFS রোগ দেখা যায়। EHP-WFS তে আক্রান্ত চিংড়ির সোনালী বাদামী সাদা খাদ্য নালী ও আলগা খোলস দেখা যায়। যদি গুরুতর ভাবে EHP সংক্রমন বেড়ে যায় তাহলে ভিব্রিও প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া এর অনান্য ভাইরাস চিংড়িতে আক্রমন করতে থাকে এবং চিংড়ির মৃত্যু হয়।

চিত্র-১ EHP আক্রান্ত চিংড়ি আকারের তারতম্য এবং বৃদ্ধির মন্দা

EHP সংক্রমণ

চিংড়ি চাষের যে কোনো সময় যে কোনো লবণাক্ততে EHP এর সংক্রমণ হতে পারে। এই রোগের সংক্রমণ সাধারণত মৌখিক পথের মাধ্যমে হয়। চিংড়ি সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হয় তাদের মল দ্বারা দূষিত সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণ করে। মরে যাওয়া চিংড়িকে খেয়ে অথবা পুকুরের জলে বা মাটিতে মাটিতে থাকা স্কোর খেয়ে এই রোগ ঝড়ায়। ব্রুডার মাছ থেকে তার সন্তানদের মধ্যে EHP রোগ

ছড়ানোর সম্ভবনা কম। অনেক অমেরুদন্ডী প্রানী যেমন পলিকিট পোকা, আর্টেমিয়া, কাঁকড়া, ছোটো শামুক বা ঝিনুক, পোকা মাকড়, বাইভালও ইত্যাদি ও চিংড়ির এই রোগ বয়ে নিয়ে আসে। হ্যাচারিতে পলিকিট পোকা ব্রুডস্টক চিংড়ির ক্ষেত্রে এই রোগ বয়ে নিয়ে আসে।

প্যাথোলোজি

EHP একটি অন্তঃকোষীয় স্পোর-গঠনকারী পরজীবী। এটি চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে হেপাটো প্যানক্রিয়াসে নেক্রোসিস তৈরী করে। এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ির যে কোনো সময়ের চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াস নিয়ে হিসটোপ্যাথোলজি করলে তার মধ্যে EHP স্পোর পাওয়া যাবে।

EHP রোগ নির্ণয়

মাইক্রোস্কোপের সাহয্যে চিংড়ির মলের নমুনা ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের স্পোর গুলিতে দেখে EHP রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে তার চিত্র ২ নং ছবিতে দেওয়া হল। এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন স্টেইন যেমন জিমসা, ফ্লোক্সিন, ট্রাইক্রোম ক্যালকোফ্লোর হোয়াইট এবং হিমাটক্সিলিন এবং ইওসিন দ্বারা, স্টেইন করে স্পোরগুলি দেখা যেতে পারে। হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের কোষের পরিবর্তন লক্ষ্য করেও এই রোগ নির্নয় করা যায়। গুরুত্বর সংক্রমণের ক্ষেত্রে হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের EHP পরজীবী স্পোর দেখা যায়। কিন্তু রোগের প্রাথমিক স্তরে স্পোর দেখা যায় না। বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি যেমন pcr & Qpcr লুপ মিডিয়েটেড আইসোথার্মাল অ্যামপ্লিফিকেশন (LAMP) ইত্যাদি দ্বারা এই রোগকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়। এই সব আধুনিক পদ্ধতিগুলি EHP রোগ, চিংড়ি মল, পোষ্ট লার্ভা এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক টিস্যু থেকে খুব দ্রুততার সাথে সঠিক ভাবে নির্ণয় করে।

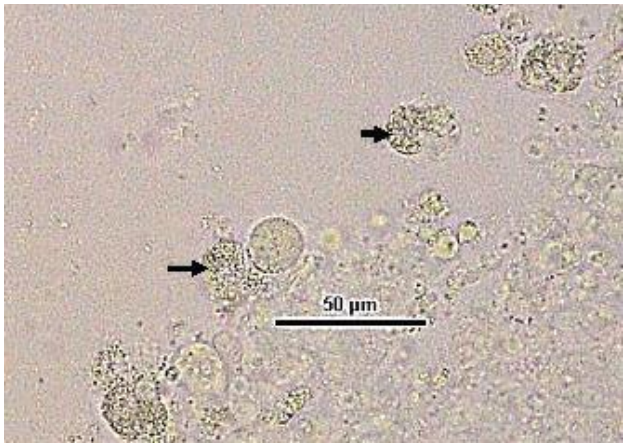

চিত্র-২ হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের ভেজা মাউন্ট হালকা মাইক্রোস্কোপরি অধীনে হেপাটোপ্যানক্রিয়াটিক টিউবুলার এপিথেলিয়াল কোষের ভিতরে EHP এর স্পোর দেখা যাচ্ছে

EHP প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

EHP- কখন নির্ণয় করতে হবে?

হ্যাচারিতে মজুত করার আগে ব্রুডারদের EHP পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি চিংড়ির বৃদ্ধির সমস্যা, খাদ্য গ্রহণের সমস্যা, খুব ধীর গতিতে খোলস ত্যাগের সমস্যা এর হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হলে চিংড়ির EHP পরীক্ষা করা উচিত। পুকুরে চিংড়ির পোস্ট-লার্ভা মজুত করার আগে EHP পরীক্ষা করা উচিত। চিংড়ির পতি পালনের সময় সাদা মল, সাদা/সোলানী খাদ্যনালী ও খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায় তাহলে সেই চিংড়ির ও EHP পরীক্ষা করা উচিত।

হ্যাচারিতে EHP এর রক্ষণাবেক্ষণ

চিংড়ির লার্ভা তৈরীতে কেবল SPF ব্রুডার/EHP নেগেটিভ ব্রুডার ব্যবহার করা উচিত। জীবন্ত খাবার ও অনান্য খাবার যা ব্যবহার করা হয়, তা আগে EHP পরীক্ষার করা উচিত। ব্রুডার চিংড়িকে খেতে দেওয়ার আগে জীবন্ত খাবার গুলিকে ৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট অথবা -২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪৮ ঘন্টা রাখার পর খেতে দেওয়া উচিত। হ্যাচারির পাইপ লাইন, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য জিনিস গুলি ব্যাবহার করার আগে সপ্তাহে একবার ২.৫% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ৩ ঘন্টা রেখে জীবাণু মুক্ত করা উচিত।

প্রতিপালন পুকুরে EHP রক্ষনাবেক্ষণ

কেবল মাত্র চিংড়ি পুকুরে EHP নেগেটিভ চিংড়ির পোস্টলার্ভক মজুত করা উচিত। যদি একবার এই রোগের পরজীবী পুকুরে আসে তাকে প্রতিহত করা খুব কঠিন। তাই কৃষকদের উচিত কঠোর জৈব সুরক্ষা ও বেটার ম্যানেজম্যান্ট প্যাকটিস (BMPs) গ্রহণ করা। যাতে পুকুরে EHP বাহক না থাকে তার জন্য প্রতি বার চাষের পর পুকুর ভাল করে শুকিয়ে এবং জীবানু মুক্ত করে পুকুর প্রস্তুত করা করা উচিত। চিংড়ি চাষে EHP সংক্রমণ হলে পরবর্তী চাষের আগে ৬ টন/হেক্টর হিসাবে কলিচুন (কুইক লাইম) ব্যাবহার করে পুকুরের পলিকে জীবানু মুক্ত করা হয়। এটা বলা হয় যে শুকনো পুকুরের পলিতে (১০-১২ সেমি) কলিচুন দেওয়া হয় এবং তার পর জল দিয়ে সেই কলিচুনকে সক্রিয় করা হয়। এছাড়াও মাটিকে জীবাণু মুক্ত করার জন্য ১৫ পিপিএম এর বেশি পটাশিয়াম পারস্যাঙ্গানেট অথবা ৪০ পিপিএম এর বেশি ক্লোরিন ব্যবহার করা পেতে পারে। জল ভরার আগে পুকুরকে এক সপ্তাহের জন্য শুকাতে হবে। পুকুরের তল দেশের জৈব পদার্থ EHP স্পোর এর রিজারভার হিসাবে কাজ করে। পলি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয় স্পোর সৃষ্টি কারী জৈব বস্তুগুলির জমাট বাঁধতে, ফ্লোকুলেট করতে এবং অলিতে জমাতে সেগুলিকে পরে পাম্পের সাহায্যে বাইরে বের করা যেতে পারে। যাতে না এই সংক্রমণ আসে তাই নতুন জল নেওয়ার আগে

সেই জলতে শোধন করা উচিত। চিংড়ি প্রতিপালনের আগে নার্সারি পুকুরে লালন পালন করা ডেতে পারে। নার্সারি পুকুর থেকে পতিপালন পুকুরে ছাড়ার পূর্বে একবার PCR টেস্ট করে নেওয়া উচিত। কঠোর জৈবসুরক্ষা এবং বেটার ম্যানেজম্যান্ট প্র্যাকটিস গ্রহন করে EHP রোগের সংক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।

হোয়াইট ফিকাল সিন্ডোম (WFS)

বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে চিংড়ির হোয়াইট ফিকাল সিন্ডোম রোগ একটি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ি সাদা মল ত্যাগ করে এবং সেগুলি জলের উপর সাদা সুতোর মতো ভেসে থাকে। এই রোগ বাগদা ও ভেনামি উভয় প্রজাতির চিংড়িতেই দেখা যয়। ভারতে ২০১৫ সালে ভেনামি চিংডি চাষে WFS এর ঘটনা খুব গুরুতর ছিল। এই রোগ হলে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার ২০-৩০ শতাংশ হারে কমে যায় এবং তার ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

WFS এর ক্লিনিক্যাল লক্ষণ

এই রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ চিংড়ি চাষের ২০-৩০ দিনের মধ্যে দেখা যায়। WFS রোগে আক্রান্ত চিংড়ির সাদা/বাদামি খাদ্যনালী, জলাশয়ে সুতোর মতো সাদা মল, খাবার খাওয়া কমে যাওয়া এবং বৃদ্ধি কমে যাওয়া, ইত্যাদি দেখা যায়। চিংড়ি WFS রোগে আক্রান্ত হয়ে ১০-৪৫ দিনের মধ্যে জলের উপরে সাদা সুতোর মতো মল ভেসে থাকতে দেখা যায়। FCR বেড়ে যাবে, চিংড়ির আকারের তারতম্য দেখা যাবে/বৃদ্ধি কমে যাবে। চিংড়ির খোলস আলগা হয়ে যাবে এবং প্রতিদিন মৃত্যুর হার বাড়বে (চিত্র-৩)। এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ি গুলিকে পুকুরের উপরে তলে ভাসতে ও সাঁতার কাটতে দেখা যায়।

এ- সাধারণ অন্ত্র সহ চিংড়ি এবং সাদা অন্ত্র সহ WFS আক্রান্ত চিংড়ি। বি- WFS আক্রান্ত চিংড়ির পুকুরের পৃষ্ঠে সাদা সুতোর মত মল ভাসছে

প্যাথোলজি

WFS রোগে আক্রান্ত চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াস ভারমিফর্ম বডিতে পরিনত হয়। ভারমিফর্ম বডি কোষ থেকে হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের এই আকার হওয়ার কারন হল হেপাটোপ্যানক্রিয়াস সৃষ্ট এগ্রিগেটেড ট্রান্সফর্ম মাইক্রোভিলি (এটিএম)। হেপাটোপ্যানক্রিয়াসে প্রচুর পরিমানে ভার্মিফম বডি জমে যায় যার ফলে সাদা মল দেখা যায়। WFS দ্বারা সংক্রমিত চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের হিস্টোপ্যাথোলজি করে ভর্মিফম বডিরের উপস্থিতি দেখা যায়। EHP হল একটি ভন্ত:কোষীয় পরজীবী যা হেপাটোপ্যানক্রিয়াস টিউবুল এপিথোলিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে বৃদ্ধি পায়। মাইক্রোস্কোপে উচ্চতর ম্যাগানিফিকেশনে (১০০%) পর্যবেক্ষন করলেই স্কোর দেখা যেতে পারে। হিস্টোপ্যাথোলজি দ্বারা সংক্রমনের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

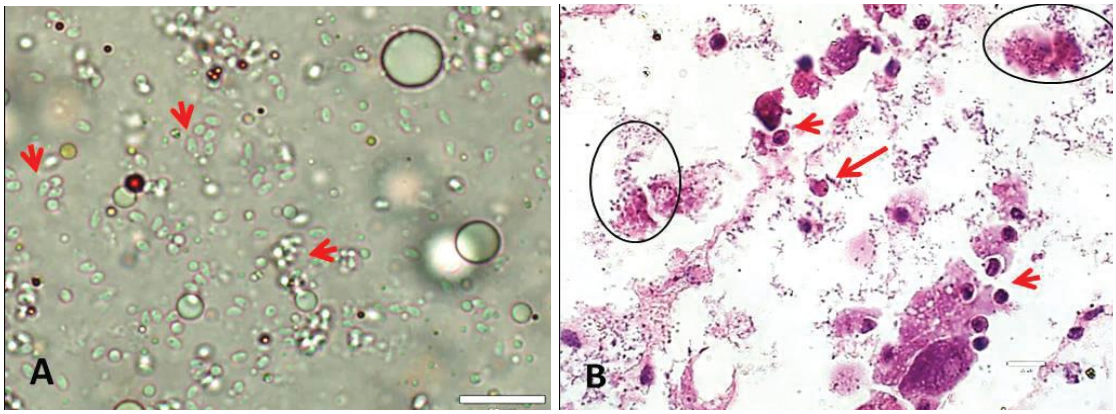

চিত্র-৪ A-WFS HP এর স্কোয়াস প্রস্তুতি ঘন পরিপক্ক EHP স্পোর দেখায়, B-WFS HP এর হিস্টোলজি বিভাগ হিমাটক্সিলিন এবং ইওসিন দ্বারা স্টেইন করে গুরুতর নাইক্রোসিস দেখায়, এপিথেলিয়াল কোষ (দীর্ঘতীর), স্পোর (বৃত্ত) এবং প্লাজমোডিয়াল পর্যায় (সংক্ষিপ্ত তীর) দেখায়

WFS রোগের কারন

এই রোগের কারন খুব জটিল এবং এটি একাধিক রোগ জীবানু দ্বারা হয়। সে গুলি হল গ্রেগরিন, *ভিব্রিও* প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া, EHP, ছত্রাক ও শৈবাল ইত্যাদি। যাই হোক সাতা সুতোর মতো মল প্রাথমিক ভাবে EHP স্পোর এবং ভার্মিফম বডিস, মিউকাস ও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গঠিত হয়। এছাড়াও ইএইচপি সংক্রামিত টিস্যু এবং *ভিব্রিও প্যারাহেমোলাইটিকাস* এবং নির্দিষ্ট প্রোসিওনিজেনিয়াম এর নির্দিষ্ট *ভিব্রিও* দ্বারা ইএইপি সংমিশ্রন করে পরীক্ষাগারে চ্যালেন্জ করে WSF এর লক্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু EHP সংক্রামিত চিংড়ির অন্ত্রের জীবাণুর গঠন ও বৈচিত্র স্বাস্থ্যকর চিংড়ির থেকে আলাদা। EHP চিংড়ি শরীরে প্রবেশ করলে চিংড়ির অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যায় এবং রোগ সৃস্টি কারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমান বেড়ে যায়। অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ায় গঠন এর এই পরিবর্তনই WFS রোগের অগ্রগতির করাণ। WFS এর ক্লিনিকাল

প্রকাশ আরো জটিল টিক যেন ডাইরিয়ার রোগের মতো। এই হোয়াইট ফিকাল রোগ হল বিভিন্ন *ভিব্রিও* প্রজাতির সমন্বয়ে EHP দ্বারা সুষ্ট একটি রোগ।

ব্যবস্থাপনা

চাষের পুকুরের কঠোর জৈব সুরক্ষা এবং বেটার ম্যানেজম্যান্ট প্যাকটিস অবলম্বন করে এই রোগ কমানো যেতে পারে। WFS রোগ হলে খাবারের পরিমান কমাতে হবে চিংড়ি পুকুরে। প্রতি দিন চিংড়ি পুকুর থেকে সাদা মল গুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। বিভিন্ন উপাদান যা হেপাটোপ্যানক্রিয়াসকে সতেজ করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেশি পরিমান খাবার দেওয়া বন্ধ করা উচিত না হলে চিংড়ির হজম ক্ষমতা কমে যাবে। উচ্চ প্রোটিন মুক্ত খাবার খাইয়ে সংক্রামিত চিংড়ির উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। যদিও WFS রোগে গ্রেগারিন এর ভূমিকা কম, তাই অ্যান্টি-গ্রেগারিন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু EHP উল্লেখযোগ্যভাবে WFS এর ঘটনার সাথে যুক্ত এবং WFS এর অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয় তাই WFS এ আক্রান্ত পুকুর গুলিতে EHP প্রতিরোধের ব্যবস্থা গুলি নেওয়া যেতে পারে। প্রতি পালন পুকুরে শুধুমাত্র EHP মুক্ত পোষ্ট-লার্ভা মজুত করা উচিত। পুকুর থেকে চিংড়ি তুলে নেওয়ার পর পুকুর ভালো করে শুকিয়ে ও জীবাণু মুক্ত করে পুকুর তৈরী করতে হবে। চিংড়ি চাষে EHP সংক্রমণ হলে পরবর্তী চাষের আগে ৬ টন/হেক্টর হিসারে ব্যবহার করে ১০-১২ সেমি লাঙল করা হয় এবং তার পর জল দিয়ে চুনটিকে কার্যকরী করা হয়। মাটিকে জীবানু মুক্ত করার জন্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ১৫ পিপিএম এর বেশি অথবা ক্লোরিন ৪০ পিপিএম বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে। বেটার ম্যানেজম্যান্ট প্যাকটিস ব্যাবস্থা কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত।

উপসংহার

হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক মাইক্রোস্পরিডিওসিস এবং হোয়াইট ফিসিস সিন্ডোম (UFS) চিংড়ি চাষে একটি অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। EHP চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসকে আক্রান্ত করে এবং চিংড়ির শারীর বৃত্তিয়, বিপাক, ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয় যার ফলে চিংড়ির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। EHP নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হল চিংড়িকে সবসময় সুস্থ ও সবল রাখা। যখন চিংড়ির অনাক্রমতা ও বৃদ্ধি ভালো থাকে তখন চিংডি খুব সহজেই এই রোগ এড়াতে পারে এবং ও পরিবেশের অনান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নার্সারি পুকুরে বা প্রতিপালন পুকুরে চিংড়ি মজুত করার আগে PCR পরীক্ষার রিপোর্ট জানা দরকার।

WFS এর চিকিৎসা করার জন্য অ্যান্টি EHP এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল থাকা উপাদান গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। বেটার ম্যানেজম্যান্ট প্রাকটিস ব্যাবস্থা সবসময় HPM এক WFS এর প্রতিরোধ করতে পারে।

স্মার্ট চাষাবাদঃ তথ্য-নির্ভর চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনার বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

এম. মুরলিধর, পি. মহালক্ষ্মী, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, জে. অশোক কুমার, জি. আর. কানাগাচিদামবরসেন, পি. কুমারারাজা এবং আর. সরস্বতী

আমরা জানি, সবার জন্য খাবারের জোগান, পুষ্টির সমস্যার সমাধান, এবং খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মাছ চাষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা "স্মার্ট চিংড়ি চাষ" ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি। এই ব্যবস্থায় ইন্টারনেট অফ থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিভিন্ন সেন্সর, ড্রোন, এমনকি রোবট ব্যবহার করে চিংড়ি চাষ অনেক সহজ ও লাভজনক করা সম্ভব। স্মার্ট চিংড়ি চাষের মাধ্যমে চাষীরা খুব সহজেই জলের গুণমান, চিংড়ির খাবারের পরিমাণ, এমনকি তাদের আচরণ ও স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখতে পারবেন। এছাড়াও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে চিংড়ির রোগ সনাক্তকরণ, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। ফলে কম শ্রম ও সময়ে বেশি উৎপাদন সম্ভব হবে, এবং চিংড়ি চাষ হবে আরও বেশি লাভজনক।

স্মার্ট চাষাবাদঃ আধুনিক প্রযুক্তি চিংড়ি চাষে

স্মার্ট চাষাবাদ মানে হল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে চিংড়ি চাষ আরও সহজ, কার্যকর এবং লাভজনক করা। এর জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ও ব্যবস্থা, যেমনঃ

- ওয়্যারলেস সেন্সরঃ এই ছোট্ট ছোট্ট যন্ত্রগুলো জলের তাপমাত্রা, পিএইচ লেভেল, অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে নিরন্তর তথ্য দিতে থাকে। ফলে চাষীরা সহজেই বুঝতে পারেন জলের গুণমান কেমন আছে এবং কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন কিনা।
- ইন্টারনেট অফ থিংসঃ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে খামারের সকল যন্ত্রপাতি একে অপরের সাথে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে চাষীর ফোনের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে চাষী ঘরে বসেই খামারের সকল তথ্য এবং যন্ত্রপাতির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংঃ এই উন্নত প্রযুক্তি বিশাল পরিমাণে তথ্য বিশ্লেষণ করে চিংড়ির আচরণ, বৃদ্ধির হার, রোগ সনাক্তকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিতে পারে। এতে করে চাষীরা আরও সূক্ষ্ম ভাবে খামার পরিচালনা করতে পারেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন।

- জলের নীচের ক্যামেরা ও কম্পিউটার ভিশন: এই প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষীরা সরাসরি জলের নীচে চিংড়ির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এছাড়াও, এই ব্যবস্থা চিংড়ির আকার, ওজন, লিঙ্গ এবং স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখতে সাহায্য করে।
- রোবট: চিংড়ি খামারে এখন রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে খাবার দেওয়া, জলের গুণমান ঠিক রাখা, এমনকি তথ্য সংগ্রহের মতো কাজে। ফলে মানুষের কাজ কমে যাচ্ছে এবং সব কিছু হচ্ছে আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে।
- ড্রোন ও মানবহীন যান: আকাশে ড্রোন তো উড়ছেই, সাথে জলের উপরে ও নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানবহীন নৌকা ও ডুবোজাহাজ! এদের মাধ্যমে খুব সহজেই পরিবেশ ও চিংড়ির উপর নজর রাখা যায়, জলের নমুনা সংগ্রহ করা যায়, এমনকি খাবার ও ওষুধ ছিটানোও যায়।
- লেজার স্ক্যানিং: এই অভিনব প্রযুক্তির মাধ্যমে জলের নীচে কোন রকম ব্যবধান না ঘটিয়েই চিংড়ির ওজন ও পরিমাণ আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
- দূর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: এখন আর খামারে থাকতে হবে না সারাক্ষণ। মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার থেকেই চাষীরা দেখতে পাবেন খামারের সকল তথ্য ও যন্ত্রপাতির অবস্থা। এমনকি প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি চালু বা বন্ধ করা যাবে দূর থেকেই।

এই সকল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চিংড়ি চাষ শিল্পে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এর ফলে চিংড়ি চাষ হয়ে উঠেছে আরও সহজ, সুন্দর এবং লাভজনক।

চিংড়ি চাষে এখন "লাইভ" আপডেট!

আগে চিংড়ি চাষ ছিল অনেকটা অন্ধকারে তীর চালানোর মতো। কিন্তু এখন আর না! "বাস্তব-সময়ের তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা" নামক এক অভিনব প্রযুক্তি চিংড়ি চাষে আনছে বিপ্লব। কিভাবে? চলুন দেখি:

- তথ্য সংগ্রহ: চিংড়ি খামারে এখন বসানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের "স্মার্ট" সেন্সর। এই সেন্সরগুলো ২৪ ঘন্টা নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করে জলের তাপমাত্রা, অক্সিজেন পরিমাণ, খাবারের হার, এমনকি চিংড়ির স্বাস্থ্যের উপরও!
- সব তথ্য একসাথে: শুধু তথ্য সংগ্রহ করলেই তো হবে না! এই সকল তথ্য একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করা হয়। ফলে খামারের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
- "স্মার্ট" বিশ্লেষণ থেকে "স্মার্ট" সিদ্ধান্ত: এই বিশাল পরিমাণ তথ্য কে ভালোভাবে বুঝতে এবং তার থেকে শিক্ষা নিতে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলো তথ্যগুলো কে বিশ্লেষণ করে চিংড়ির জন্য কোন ধরণের পরিবেশ উপযোগী, কখন কি পরিমাণে খাবার দিতে হবে, এমনকি রোগ হওয়ার আগেই সতর্ক করে দিতে পারে!
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা: আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। খাবার কখন কতটুকু দিবেন, জলের গুণগত মান কিভাবে ঠিক রাখবেন, রোগ প্রতিরোধ কিভাবে করবেন - এসব বিষয়ে থেকে পাওয়া তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন চাষিরা। এমনকি ভবিষ্যতে কত উৎপাদন হবে, কত খরচ হবে তাও আগে থেকেই আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে!
- স্বয়ংক্রিয়করণ এবং নিয়ন্ত্রণ: তথ্য বিশ্লেষণ করে খামারের বিভিন্ন কাজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন: চিংড়ির বৃদ্ধির হার বুঝে স্বয়ংক্রিয় ভাবে খাবারের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো, জলের গুণগত মান ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি।
- বিপদ আসার আগেই "সতর্কীকরণ": খামারে কোন বিপদ আসার আগেই "স্মার্ট" সেন্সর চাষীদের সতর্ক করে দিতে পারে। যেমন: জলের গুণগত মান হঠাৎ খারাপ হলে, কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে চাষিরা জানতে পারবেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
- ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ: শুধু বর্তমান নয়, অতীতের তথ্য বিশ্লেষণ করেও চিংড়ি চাষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব। যেমন: গত কয়েক বছরে কোন মৌসুমে চিংড়ির কি রকম রোগ হয়েছিল, কিভাবে তা প্রতিরোধ করা হয়েছিল - এসব তথ্য থেকে ভবিষ্যতে আরও ভালো ভাবে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতের ধারণা এবং পূর্বাভাস: আগের সময়ের তথ্য এবং বর্তমানের "লাইভ" তথ্য একসাথে বিশ্লেষণ করে এখন চিংড়ি চাষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সম্ভব! কত

চিংড়ি উৎপাদন হবে, বাজারে চাহিদা কতটুকু থাকবে এমনকি কখন চিংড়ি ধরলে বেশি লাভ হবে তাও আগে থেকেই বলে দিতে পারবে "স্মার্ট" কম্পিউটার প্রোগ্রাম।

- খামার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের সাথে একীকরণ: খামারের সকল তথ্য এবং বিশ্লেষণ একটি "স্মার্ট" সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একসাথে দেখা সম্ভব হবে। চাষিরা খুব সহজেই খামারের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

  বাস্তব-সময়ের তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ হবে আরও লাভজনক এবং ঝুঁকিমুক্ত। চিংড়ির স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে চিংড়ি চাষকে একটি "সোনালী" সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে পরিণত করবে এই "স্মার্ট" প্রযুক্তি।

চিংড়ি চাষে স্মার্ট ফার্মিং এবং তাৎক্ষণিক তথ্যভিত্তিক প্রয়োগ

চিংড়ির স্মার্ট ফার্মিং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগুলি আবিষ্কৃত হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে -জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা: খাদ্য পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা, রোগ সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ

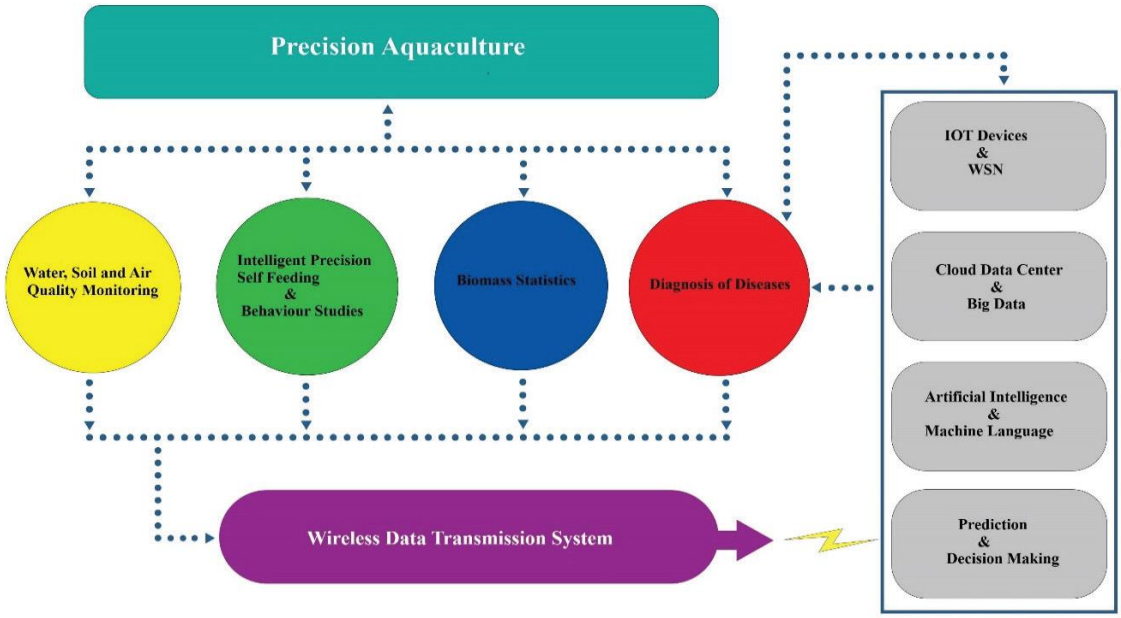

ক. চিংড়ি চাষে জলের গুণমান নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা

আমরা তো জানিই, চিংড়ি মাছটা ভীষণ সংবেদনশীল । জলের একটুখানি গোলমাল হলেই ওদের বিপদ। তাই চিংড়ি চাষে জলের গুণমান যাতে ঠিক থাকে, সেদিকে নজর রাখা খুব দরকার। আর এই কাজটা আরও সহজ করে দিতে এসেছে স্মার্ট পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় আছে অত্যাধুনিক সেন্সর, যা পুকুরের জলের প্রতিটা খুঁটিনাটি খবর রাখে। এছাড়াও আছে পর্যবেক্ষণ

ব্যবস্থা এবং তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল, যা চিংড়ির বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এই ব্যবস্থা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে এবং পুকুরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই স্মার্ট সিস্টেমটা তাপমাত্রা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, ঘোলাটে, শৈবাল এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন জনসংখ্যা, সবকিছু এই ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এই সব তথ্য একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চাষির কাছে পৌঁছে যায়। ওয়াই-ফাই বা মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেন্সরগুলো সব খবর একটা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বা ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে পাঠিয়ে দেয়। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে চাষি খুব সহজেই তার মোবাইল ফোনে বসেই পুকুরের জলের গুণমান সম্পর্কে সব জানতে পারেন। এতে করে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং উৎপাদনশীল চিংড়ি পুকুর তৈরি করতে পারেন।

সেন্সর এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ: চিংড়ি চাষে আধুনিকতার মেলবন্ধন

চিংড়ি চাষে জলের গুণমান নিয়ন্ত্রণে এখন ব্যবহার হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। সেন্সর এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের গুণমান সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

- সঠিক অক্সিজেনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা: জলে অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় যুক্ত সেন্সর যদি দেখে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ অক্সিজেন সরবরাহ করা শুরু করে। এতে করে চিংড়ি মাছ সবসময় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায়।

- জল পরিশোধন এবং পরিচালন: নোংরা জল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। স্মার্ট পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জলের গুণমান পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে জল পরিশোধন এবং পরিচালন ব্যবস্থা চালু করে। এতে করে খামারের জল সবসময় পরিষ্কার থাকে।
- ক্ষতিকারক পদার্থ নিয়ন্ত্রণ: জলে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে চিংড়ির ক্ষতি হতে পারে। স্মার্ট সিস্টেম এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলি সনাক্ত করে এবং জল বদল বা জৈব পরিশোধন প্রক্রিয়া চালু করে।

খ. খাদ্য পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা: স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যের সঠিক ব্যবহার

চিংড়ি চাষে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো চিংড়ির খাবার । খাবার ঠিক মতো না হলে চিংড়ি ঠিক মতো বড় হবে না, উৎপাদনও কম হবে। কিন্তু এখন আর চিন্তার কোন কারণ নেই! "স্মার্ট প্রযুক্তি" এই কাজ সঠিকভাবে করতে পারে ।

কীভাবে কাজ করে এই স্মার্ট ব্যবস্থা?

- খাবারের হিসাব একদম ঠিক: স্মার্ট সেন্সর, ওজন মাপার যন্ত্র, এবং ক্যামেরার মাধ্যমে চিংড়িকে কতটা খাবার দেওয়া হচ্ছে তা একদম ঠিক ঠিক নজর রাখা হয়। ঠিক যেন একজন হিসাব রক্ষক বসে আছে!
- নিজেই খাবার দেবে: একবার সময় হলেই স্মার্ট মেশিন নিজেই চিংড়িকে খাবার দিয়ে দেবে। আর কোন কষ্ট করে খাবার ছিটাতে হবে না!
- পরিবেশ বুঝে খাবার: এই স্মার্ট ব্যবস্থা শুধু খাবার দেয় না, পরিবেশের দিকেও নজর রাখে। জলের তাপমাত্রা, চিংড়ির বৃদ্ধির হার দেখে খাবারের পরিমাণ কম বেশি করে। ঠিক যেন একজন অভিজ্ঞ চাষি যেভাবে খেয়াল রাখেন!
- খাবারের গুণমান চেক: খাবারের গুণ ভালো কি না তাও পরীক্ষা করে এই স্মার্ট ব্যবস্থা। ফলে খারাপ খাবার থেকে চিংড়ি রক্ষা পাবে।
- সব তথ্য হাতের মুঠোয়: চাষিরা মোবাইল ফোনেই দেখে নিতে পারবেন চিংড়ি কতটা খাবার খাচ্ছে, কতটা অপচয় হচ্ছে। সব তথ্য একদম হাতের মুঠোয়!

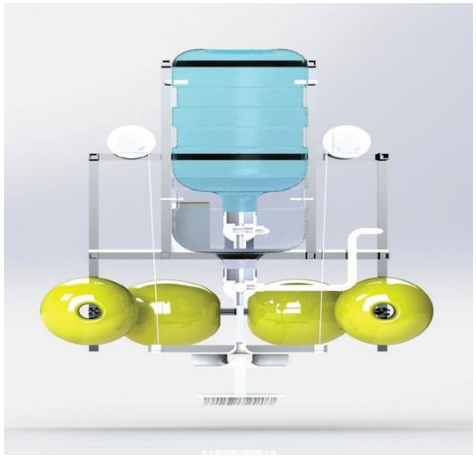

**গ.	রোগ সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ: আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে**

চিংড়ি চাষে রোগের প্রাদুর্ভাব একটি বড় সমস্যা। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন রোগ সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

- তাৎক্ষণিক রোগ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা: তাৎক্ষণিক রোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জলের গুণমান, চিংড়ির আচরণ এবং অন্যান্য সূচক বিশ্লেষণ করে রোগের প্রাথমিক লক্ষণ সনাক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জলের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং অক্সিজেনের মাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।
- চিংড়ির আচরণ পর্যবেক্ষণ: রোগাক্রান্ত চিংড়ির আচরণে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে রোগ সনাক্ত করা সম্ভব।
- স্মার্ট বিশ্লেষণ এবং সতর্কতা: রিয়েল-টাইম তথ্য বিশ্লেষণ এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষিদের যেকোনো অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। এতে করে তাঁরা সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।
- চিংড়ির শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ: চিংড়ির রক্ত পরীক্ষা বা অন্যান্য পদ্ধতিতে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পাচন প্রক্রিয়া এবং জিনগত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব।
- নিয়মিত রোগ পরীক্ষা: নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে চিংড়ির মধ্যে প্রচলিত রোগ বা রোগজীবাণু সনাক্ত করা হয়। এই তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করে আক্রান্ত চিংড়ি সনাক্ত করা এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়।
- রোগ ভবিষ্যদ্বাণী: পূর্ববর্তী রোগ সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

- বিশেষজ্ঞের পরামর্শ: রিমোট কমিউনিকেশন চ্যানেল বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাষিরা চিংড়ি রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারেন।

গ. রোগ সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ: আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে

চিংড়ি চাষে রোগের প্রাদুর্ভাব একটি বড় সমস্যা। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এখন সময়ের আগেই রোগ সনাক্ত করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

কিভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি?

- তাৎক্ষণিক রোগ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা: এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি, তথ্য বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে চিংড়ির রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্ত করা হয়।
- জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ: জলের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব এবং অক্সিজেনের মাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করে চাষিদের সতর্ক করা হয়।
- চিংড়ির আচরণ পর্যবেক্ষণ: রোগাক্রান্ত চিংড়ির আচরণে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে রোগ সনাক্ত করা সম্ভব।
- রিয়েল-টাইম তথ্য বিশ্লেষণ: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য (যেমন - জলের গুণমান, চিংড়ির আচরণ) তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করে রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।
- জৈব সূচক পর্যবেক্ষণ: চিংড়ির রক্ত পরীক্ষা বা অন্যান্য পদ্ধতিতে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পাচন প্রক্রিয়া এবং জিনগত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব।
- নিয়মিত রোগ পরীক্ষা: নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে চিংড়ির মধ্যে প্রচলিত রোগ বা রোগজীবাণু সনাক্ত করা হয়। এই তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করে আক্রান্ত চিংড়ি সনাক্ত করা এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়।
- রোগ ভবিষ্যদ্বাণী: পূর্ববর্তী রোগ সংক্রান্ত তথ্য

এই সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চিংড়ি চাষ আরও লাভজনক হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

উপসংহার:

চিংড়ি চাষ করে এখন আর শুধু রোদ বৃষ্টির ভয় নেই, আধুনিক প্রযুক্তি যেন হয়ে উঠেছে চাষিদের "সাথী"। স্মার্ট চাষাবাদ এবং রিয়েল-টাইম তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ হয়ে উঠেছে আরও সহজ, এবং লাভজনক। আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে, স্মার্ট চিংড়ি চাষ যেন এক নতুন দিগন্তের সূচনা করছে। রিয়েল-টাইম তথ্য বিশ্লেষণ, সঠিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে চিংড়ি চাষ হয়ে উঠছে আরও সহজ, লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব। যদিও কিছু প্রযুক্তিগত এবং ব্যয় সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবুও ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলে ভবিষ্যতে স্মার্ট চিংড়ি চাষ আরও সুলভ ও সহজলভ্য হবে, যা বিশ্বব্যাপী চিংড়ির চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে এই ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরণের সেন্সর এবং প্রযুক্তি রয়েছে যা একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না ও হতে পারে। এছাড়াও, এই প্রযুক্তিগুলো এখনও কিছুটা ব্যয়বহুল।তবে ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তিগুলো আরও উন্নত, সুলভ এবং সহজলভ্য হবে বলে আশা করা যায়। ফলে চিংড়ি চাষ আরও সহজ, লাভজনক হয়ে উঠবে।

জমি, জল, খাদ্য এবং শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য নির্ধারণযোগ্য নিবিড় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা

কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, এম. কুমারন, এ. পানিগ্রাহী, কে. আম্বাশঙ্কর,
জে. শ্যামদয়াল এবং কুলদীপ কে. লাল

বিশ্ববাজারে চিংড়ি রপ্তানিতে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সাফল্য সত্ত্বেও, চিংড়ি শিল্পকে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পরিবর্তনশীল রপ্তানি বাজার, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে যাওয়া, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, এবং রোগ-বালাই এই শিল্পের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। অন্যান্য খাদ্য শিল্পের মতো, চিংড়ি চাষও এই অনিশ্চয়তার বাইরে নয়। তবে আশার কথা হলো, প্রকৌশল, জীববিজ্ঞান এবং ব্যবসায়িক কৌশলের সমন্বয়ে একটি টেকসই এবং লাভজনক চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব। বাছাইকৃত ভাবে প্রজনন করা, নির্দিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী জীব (প্যাথজেন) মুক্ত প্যাসিফিক সাদা চিংড়ি (*Penaeus vannamei*) ভারতে ব্যাপক ভাবে চাষ করা হয়। উচ্চ প্রকৌশলী চাষ পদ্ধতিতে দ্রুত বর্ধনশীল এবং ৩০০/বর্গমিটার পর্যন্ত উচ্চ ঘনত্বে চাষের জন্য উপযুক্ত। এই পদ্ধতিতে জমি, জল এবং শক্তির অপচয় হয় বেশি। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। এই পদ্ধতিতে জমি, জল এবং শক্তির অপচয় হয় বেশি। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। এছাড়াও, এই পদ্ধতিতে চিংড়ির সম্পূর্ণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরিমাপ করা যায় না এবং ঘন ঘন ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, যা চাষিদের জন্য বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধানে "নির্ধারণযোগ্য নিবিড় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা" একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। এই পদ্ধতিতে জমি, জল, খাদ্য এবং শক্তির যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

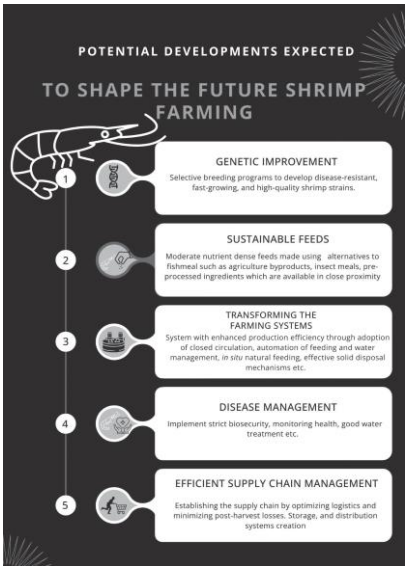

চিংড়ি চাষের ভবিষ্যৎ: সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে যে পদ্ধতিগুলি

চিংড়ি চাষকে আরও লাভজনক এবং টেকসই করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

১) উন্নত জাতের চিংড়ি:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, দ্রুত বর্ধনশীল এবং উন্নত মানের চিংড়ি উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রজনন করা।

২) পুষ্টিকর ও সহজলভ্য খাবার:

মাছের গুঁড়োর উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষি থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিকর উপাদান, যেমন- পতঙ্গচূর্ণ, খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা।

৩) আধুনিক চাষ ব্যবস্থা:

চিংড়ি চাষের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ, যেমন- বদ্ধ জলাশয়ে জল সঞ্চালন, স্বয়ংক্রিয় খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা, কার্যকর জল পরিশোধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

৪) রোগ নিয়ন্ত্রণ:

রোগ-বালাই প্রতিরোধে জোর দিয়ে কঠোর জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং উন্নত জল পরিশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৫) উন্নত সরবরাহ ব্যবস্থা:

উৎপাদিত চিংড়ি সঠিক ভাবে সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য একটি দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা।

এই সমস্ত বিষয় "Farmers' Handbook" বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটি চিংড়ি চাষীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

চিংড়ি চাষ: সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে বিষয়গুলি বিবেচনীয়

চিংড়ি চাষ শুরু করার আগে একজন চাষিকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি তার চাষের পরিধি ও সাফল্যের উপর প্রভাব ফেলে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:

- জলবায়ু: স্থানীয় জলবায়ু চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত কিনা।

- খামারের অবস্থান: পুকুরের জল নিকাশ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাজারের নিকটবর্তীতা।
- সম্পদের সহজলভ্যতা ও খরচ: জমি, জল, বিদ্যুতের সহজলভ্যতা এবং দাম।
- পরিবহন ব্যবস্থা: চিংড়ি পরিবহনের জন্য সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- আর্থিক সম্ভাব্যতা: প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের সামর্থ্য।
- শ্রমিক: কাজের জন্য সুলভ মূল্যে দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা।
- খাদ্য ও সরঞ্জাম: চিংড়ির খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সরবরাহ ও দাম।
- সরকারি নীতিমালা: চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা, অনুমোদন ও প্রবিধান।
- বাজার ও দাম: চিংড়ির চাহিদা, বাজার মূল্য এবং বিক্রির সুযোগ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করে একজন চাষি তার চাষের পরিধি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জৈব পদ্ধতি:

চিংড়ির উৎপাদন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি হলো জীবাণু, শৈবাল, কোপেপডস, প্লাঙ্কটোনিক জীব এবং অন্যান্য উপকারী জৈব উপাদানের সমন্বয়ে একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করা। এই পদ্ধতিতে জলের গুণমান ভালো থাকে, প্রাকৃতিক খাদ্যের জোগান বৃদ্ধি পায় এবং চিংড়ির বৃদ্ধি দ্রুত হয়। ফলে খাদ্য খরচ কমে, উৎপাদন বেড়ে যায় এবং পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। তবে এই পদ্ধতি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা।

প্রচলিত পুকুরে কিছু পরিবর্তন এনে বায়োফ্লক (biofloc) ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা সবসময় সফল হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনার জটিলতা এবং উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।এই সমস্যার সমাধানে আমরা একটি নতুন ধারণা প্রস্তাব করছি: "বৃত্তাকার স্ব-পরিষ্কার পুকুর"। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য চক্র তৈরি করে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জল পরিশোধন ব্যবস্থা ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ মাইক্রোকোজম (microcosm) তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে জল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না বলে জলের অপচয় রোধ হয়। এছাড়াও, জমি, শক্তি ও খাদ্যের ব্যবহার অনেক কম হয়, যা চিংড়ি চাষকে টেকসই ও লাভজনক করে তোলে।এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কার্যকর জল ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করা, যা চিংড়ির খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে এবং জমি, জল ও শক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ: নিবিড় চিংড়ি চাষের নতুন দিগন্ত

"Biofloc" প্রযুক্তি, জল পুনঃব্যবহার এবং কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি চাষকে আরও উৎপাদনশীল, লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব করা সম্ভব। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি অভিনব চিংড়ি চাষ ব্যবস্থার নকশা করা হয়েছে।

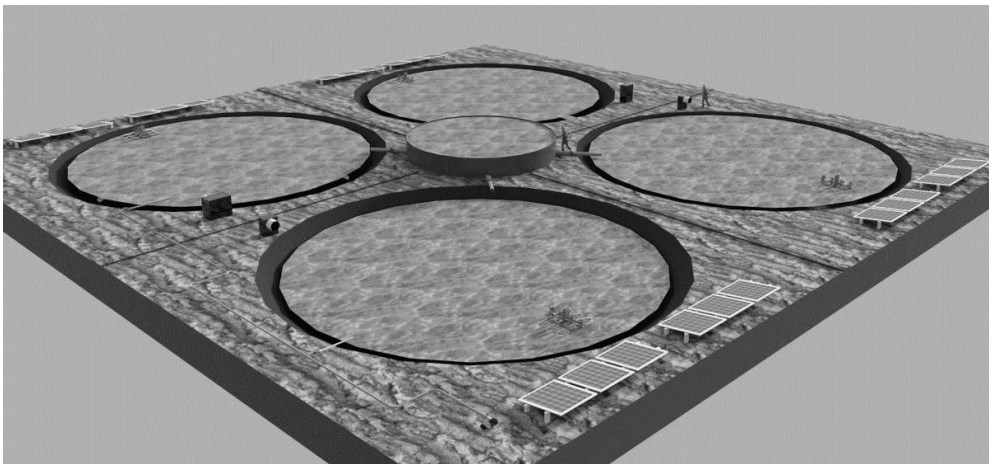

এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো:

- চারটি সংযুক্ত পুকুর: টেকসই এবং উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন দিয়ে তৈরি চারটি বৃত্তাকার পুকুর (প্রতিটি ৩০০-৫০০ ঘনমিটার)। এই পুকুরগুলি পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি কেন্দ্রীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে পুকুর পরিষ্কার করে।
- উন্নত নার্সারি: একটি বিশেষ নার্সারি ট্যাঙ্ক যেখানে ছোট চিংড়িগুলিকে পালন করা হয় এবং পরে বড় পুকুরে স্থানান্তর করা হয়।

কার্যকর ব্যবস্থাপনা:

এই সিস্টেমটি পরিচালিত হয় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যেখানে জোর দেওয়া হয়:

- প্রাকৃতিক খাদ্য: "Biofloc" প্রযুক্তির মাধ্যমে পুকুরের জলেই চিংড়ির খাদ্য তৈরি করা জল পুনঃব্যবহার: কার্যকর জল পরিশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে জল পুনঃব্যবহার করে জলের অপচয় রোধ করা
- স্বয়ংক্রিয় খাদ্য পরিবেশন: প্রযুক্তির মাধ্যমে চিংড়িকে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে খাদ্য সরবরাহ করা (অটোমেশন)
- শক্তির সঠিক ব্যবহার: বিদ্যুৎ খরচ কমাতে আধুনিক সেন্সর ব্যবহার করা (লজিক্যাল সেন্সর)

"Biofloc" এবং জল পুনঃব্যবহার প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই এবং উৎপাদনশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব। এই ধরণের ব্যবস্থার নকশা এবং নির্মাণে আধুনিক প্রকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পুকুরের গঠন:

এই ব্যবস্থায় সাধারণত চারটি বৃত্তাকার পুকুর ব্যবহার করা হয়, যেগুলি টেকসই এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য HDPE জিওমেমব্রেন দিয়ে তৈরি। এই পুকুরগুলির সাথে একটি নার্সারি পুকুর যুক্ত থাকে যেখানে ছোট চিংড়িগুলিকে প্রথমে পালন করা হয়।

স্থাপনের পদ্ধতি:

- মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার: একটি পদ্ধতিতে, নার্সারি পুকুরটি অন্যান্য পুকুরের তুলনায় কিছুটা উঁচুতে স্থাপন করা হয়। এতে করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যবহার করে সহজেই ছোট চিংড়িগুলিকে বড় পুকুরে স্থানান্তর করা যায়।
- একই সমতলে: অন্য একটি পদ্ধতিতে, সমস্ত পুকুর একই সমতলে স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে, জাল বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে নার্সারি পুকুর থেকে বড় পুকুরে চিংড়ি স্থানান্তর করা হয়।

জিআই ফ্রেমের ব্যবহার:

পুকুরের গঠন আরও সুদৃঢ় করার জন্য জিআই (Galvanized Iron) ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ফ্রেমের উপর HDPE জিওমেমব্রেন স্থাপন করা হয়। এছাড়াও, পুকুরের ঢাল এবং কেন্দ্রীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিকভাবে তৈরি করা হয় যাতে পুকুরের জল পরিষ্কার রাখা সহজ হয়।

একক পালন ইউনিট: কার্যকর জল ব্যবস্থাপনা এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ

চারটি পালন পুকুর এবং একটি নার্সারি পুকুর ("৪+১" ব্যবস্থা) মিলে একটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকর চিংড়ি পালন একক তৈরি করে। এই ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় কার্যকর জল ব্যবস্থাপনা, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই পদ্ধতির উপর।

১) জল সঞ্চালন:

- মাধ্যাকর্ষণ এবং পাম্প: পুকুরগুলির মধ্যে জল সঞ্চালনের জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (৪০-৫০%) এবং পাম্প উভয়ই ব্যবহার করা হয়। এতে করে জল সঞ্চালন ব্যবস্থা কার্যকর হয় এবং শক্তির অপচয় কম হয়।

- ভালভ পাইপ: পুকুরগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত আকারের ভালভ পাইপ ব্যবহার করা হয়, যা জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

২) স্ব-পরিষ্কার ব্যবস্থা:

- দ্বৈত নিষ্কাশন: প্রতিটি পুকুরে দুটি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে - একটি পৃষ্ঠতল থেকে এবং অন্যটি নিচ থেকে - যা পুকুরের জল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
- জল প্রবাহ: পুকুরের জল নিয়মিত ভাবে প্রবাহিত করা হয় যাতে অপ্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ জমা না হয় এবং জল স্বচ্ছ থাকে।

৩) বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ:

- লজিক্যাল সেন্সর: পুকুরের জলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য বায়ুচালক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রগুলি লজিক্যাল সেন্সর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা জলে অক্সিজেনের পরিমাণ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।
- প্যাডেল হুইল এবং অ্যারো ডিফিউজার: জল সঠিক ভাবে অক্সিজেন মিশ্রিত করার জন্য প্যাডেল হুইল এবং অ্যারো ডিফিউজার ব্যবহার করা হয়।

৪) খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

- স্বয়ংক্রিয় ফিডার: চিংড়িকে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে খাদ্য সরবরাহের জন্য স্বয়ংক্রিয় ফিডার ব্যবহার করা হয়। এতে খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং এবং চিংড়ি সঠিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। এতে চাষির খাদ্য খরচ কমে। পুকুরের জলে ভাসমান কঠিন পদার্থের পরিমাণ নিয়মিত ভাবে পরিমাপ করা গুরুত্বপূর্ণ।যদি এই পদার্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তবে পুকুরের কেন্দ্র থেকে স্থাপিত নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অপসারণ করা উচিত। "Biofloc" প্রযুক্তি এবং কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুকুরের পরিবেশ সুস্থ এবং চিংড়ির জন্য উপযোগী রাখা সম্ভব হয়।

চিংড়ি পুকুর নির্মাণ: আকার, উপকরণ এবং বিবেচ্য বিষয়

চিংড়ি পুকুর তৈরির ক্ষেত্রে পুকুরের আকার, ব্যবহৃত উপকরণ এবং স্থানীয় পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুকুরের আকার এবং গঠন:

- ৪+১ ব্যবস্থা: এই ব্যবস্থায় চারটি পালন পুকুর এবং একটি নার্সারি পুকুর থাকে।
- ছোট বৃত্তাকার পুকুর: প্রতিটি পুকুর ৫০০ থেকে ৮০০ ঘনমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- বৃত্তাকার ট্যাঙ্ক: বিকল্পভাবে, ৩০০ থেকে ৬০০ বর্গমিটার আকারের বৃত্তাকার ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ধাতব ফ্রেম: ট্যাঙ্কগুলি সাধারণত গ্যালভানাইজড ধাতব ফ্রেম দিয়ে তৈরি হয় এবং মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে স্থাপন করা হয়।

উপকরণ নির্বাচন:

পুকুর তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। চাষির উচিত তার সম্পদের প্রাপ্যতা, জমির ধরণ এবং স্থানীয় পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সঠিক উপকরণ নির্বাচন করা।

জনপ্রিয় উপকরণ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য:

১. পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড):

- সুবিধা: টেকসই, নমনীয়, রাসায়নিক প্রতিরোধী, সূর্যের আলো প্রতিরোধী, ছিদ্র প্রতিরোধী, তুলনামূলক সস্তা, স্থাপন করা সহজ।
- অসুবিধা: সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হতে পারে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক জলে মুক্ত করতে পারে।
- উপযোগিতা: ছোট এবং মাঝারি আকারের পুকুরের জন্য উপযুক্ত।

২. EPDM (ইথিলিন প্রোপিলিন ডাইন মনোমার):

- বৈশিষ্ট্য: এটি একটি ধরণের সিন্থেটিক রাবার যা খুবই স্থিতিস্থাপক, টেকসই এবং সূর্যের আলো এবং রাসায়নিক প্রতিরোধী।
- সুবিধা: পিভিসির তুলনায় বেশি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী, ছিদ্র এবং ফাটল প্রতিরোধী।
- উপযোগিতা: বড় আকারের চিংড়ি পুকুরের জন্য উপযুক্ত।

৩. HDPE (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন):

- বৈশিষ্ট্য: এটি একটি শক্তিশালী, টেকসই এবং রাসায়নিক ও সূর্যের আলো প্রতিরোধী উপকরণ।

- সুবিধা: পিভিসির তুলনায় বেশি টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী, ছিদ্র এবং ফাটল প্রতিরোধী।
- উপযোগিতা: বড় আকারের চিংড়ি পুকুরের জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে যেখানে মাটি পাথুরে।

সঠিক লাইনার নির্বাচন:

- বিবেচ্য বিষয়: পুকুরের আকার, জলের গুণমান এবং চিংড়ির প্রজাতি।
- বিশেষজ্ঞের পরামর্শ: একজন অভিজ্ঞ মৎস্য চাষি বা জলজ প্রাণী বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে সঠিক লাইনার নির্বাচন করা উচিত।

ভারতীয় পরিস্থিতিতে HDPE:

- পরামর্শ: ভারতীয় পরিবেশে চিংড়ি চাষের জন্য HDPE লাইনার বেশি পরামর্শ করা হয়।
- আকার এবং বেধ: HDPE লাইনার বিভিন্ন আকার এবং বেধে পাওয়া যায়। পুকুরের আকার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক আকার এবং বেধ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ।

HDPE লাইনার: আকার এবং বেধ নির্বাচন

HDPE লাইনার বিভিন্ন আকার এবং বেধে পাওয়া যায়। পুকুরের জন্য সঠিক আকার এবং বেধ নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তা সঠিক ভাবে স্থাপন করা যায় এবং দীর্ঘদিন টিকে।

সাধারণ মাপ:

- প্রস্থ: ৬ থেকে ১৫ মিটার (২০ থেকে ৫০ ফুট)।
- দৈর্ঘ্য: পুকুরের আকারের উপর নির্ভর করে।

বেধ এবং তাদের ব্যবহার:

- ০.৫ মিমি (২০ মিলিমিটার): ছোট এবং সাধারণ পুকুরের জন্য উপযুক্ত।
- ০.৭৫ মিমি (৩০ মিলিমিটার): মাঝারি আকারের পুকুরের জন্য উপযুক্ত যেখানে জলের পরিমাণ মোটামুটি বেশি।
- ১ মিমি (৪০ মিলিমিটার): মাঝারি থেকে বড় আকারের পুকুরের জন্য উপযুক্ত যেখানে জলের পরিমাণ বেশি এবং কিছু বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

- ১.৫ মিমি (৬০ মিলিমিটার): খুব বড় আকারের পুকুরের জন্য উপযুক্ত যেখানে জলের পরিমাণ অনেক বেশি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ:

পুকুরের জন্য সঠিক আকার এবং বেধের HDPE লাইনার নির্বাচন করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মৎস্য চাষি বা জলজ প্রাণী বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মাটির ধরণ, জমির ঢাল, জলের গুণমান এবং পুকুরের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

কমপ্যাক্ট ৪+১ চিংড়ি চাষ: বর্ষব্যাপী উৎপাদনের কৌশল

ঐতিহ্যবাহী চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে বছরে মাত্র দুটি চক্র চাষ করা সম্ভব হত। কিন্তু "কমপ্যাক্ট ৪+১" একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি যা জমি, জল, বিদ্যুৎ এবং খাদ্যের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বছর জুড়ে চিংড়ি উৎপাদনের সুযোগ দেয়।

পদ্ধতিটি কিভাবে কাজ করে:

- নার্সারি ট্যাঙ্ক: প্রতি মাসে, রোগমুক্ত এবং মানসম্পন্ন চিংড়ির পোনা নার্সারি ট্যাঙ্কে মজুত করা হয়।
- পালন পুকুরে স্থানান্তর: এক মাস পর, পোনাগুলিকে একটি পালন পুকুরে স্থানান্তর করা হয় এবং তিন মাস ধরে পালন করা হয়।
- নিয়মিত চক্র: প্রতি মাসে নতুন পোনা নিয়ে এই চক্র চলতে থাকে। যখন একটি পুকুর থেকে চিংড়ি ধরা হয়, তখনই সেখানে নতুন পোনা মজুত করা হয়।
- জল পুনর্ব্যবহার: চিংড়ি ধরার পর, পুকুরের জল অন্য একটি পুকুরে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এতে জল এবং খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং পুকুর প্রস্তুত করার সময় কম লাগে।

সুবিধা:

- বর্ষব্যাপী উৎপাদন: এই পদ্ধতিতে বছর জুড়ে চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।
- সম্পদের সঠিক ব্যবহার: জমি, জল, বিদ্যুৎ এবং খাদ্যের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।
- উৎপাদন বৃদ্ধি: একই স্থানে বেশি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

উচ্চ মজুত এবং আংশিক ধরা:

চাষিরা তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং সম্পদের উপর নির্ভর করে পুকুরে বেশি পোনা মজুত করতে পারেন এবং ধাপে ধাপে চিংড়ি ধরতে পারেন। এটি উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করে।

চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রচলিত এবংআধুনিক যুগের মূল পরামিতিগুলি/উপাদানগুলির মধ্যে একটি তুলনাঃ

পরামিতি/উপাদান	প্রচলিত	আধুনিক
ভৌতিক উপাদান		
পুকুরের আকার	আয়তাকার	বৃত্তাকার
পুকুরের আয়তন (ঘন মিটার)	৪০০০ থেকে ১৫০০০	৩৫০ থেকে ৫০০
পুকুরের তলদেশ	মাটির	HDPE
নিষ্কাশনের ধরন	স্লুইস গেট (Sluice Gate)	কেন্দ্রীয় দ্বৈত নিষ্কাশন নালী
বায়ু চলাচল ব্যবস্থা	অবিরাম	নিয়ম করে যা সেন্সর নিয়ন্ত্রিত
চাষের দিক		
চাষের প্রকৃতি	শৈবাল/Algal ভিত্তিক, সরাসরি মজুত	বায়ুফ্লক ভিত্তক মিশ্র খাদ্য প্রদান
খাদ্য	পেলেট খাবার	পেলেট খাবার
খাদ্য রূপান্তর অনুপাত (FCR)	১.২ থেকে ১.৫	০.৯ থেকে ১.১
বৃদ্ধি (সাপ্তাহিক-গ্রাম)	১.৫-১.৮	১.৮-২.০
উতপাদন হার (তন/হেকটর)	১০	৩০
চাষ চক্র/বছর	২	৪: অবিরাম: দুই ধাপে চাষ
জৈব নিরাপত্তার মাত্রা	কম	বেশি
চিংড়ি আহরন/Harvesting	চাষের শেষে অনেক পরিমানে	মাসিক আহরণ
রোগের ঝুঁকি	বেশি	কম
জল পরিবর্তনের হার	১০০০-৩০০০%	২০০-৩০%
শক্তি খরচ (কিলো ওয়াট টন চিংড়ি)	বেশি	৫০% কম করা যেতে পারে
মূলধন বিনিয়োগ	কম	অনেক বেশি

নতুন যুগের চিংড়ি চাষ: কার্যকারিতা এবং সুবিধা

এই নতুন পদ্ধতিটি বর্তমান বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতি এবং ICAR-CIBA তে পরীক্ষিত ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য:

- মাসিক মজুত এবং ধরা: একটি নার্সারি এবং চারটি পালন পুকুর ব্যবহার করে প্রতি মাসে চিংড়ি মজুত এবং ধরা সম্ভব। এতে চাষিরা প্রতি মাসে আয় করতে পারবেন, যা ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: এই পদ্ধতি পুরোপুরি জৈব-নিরাপদ, যার ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা: স্বয়ংক্রিয় খাদ্য প্রদান, জলের গুণমান পরিমাপক (অক্সিজেন এবং ক্ষারধর্মীয়তা) এবং স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা খাদ্য, বিদ্যুৎ এবং শ্রমের খরচ কমায়।
- উৎপাদন বৃদ্ধি: এই পদ্ধতিতে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির তুলনায় তিন গুণ বেশি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।
- জল সংরক্ষণ: পুকুরগুলি পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য HDPE পাত দিয়ে তৈরি হওয়ায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।
- প্রাকৃতিক খাদ্য: পুকুরে জীবাণু, শ্যাওলা, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবের মিশ্র চাষ করে চিংড়ির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। এতে খাদ্যের খরচ কমে এবং জল পরিষ্কার থাকে।

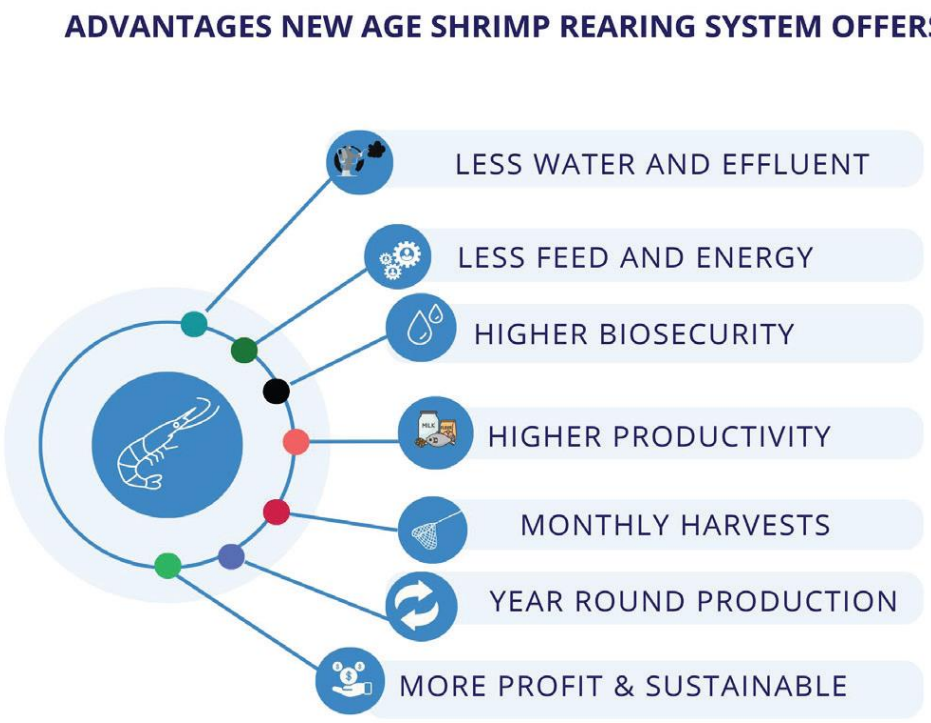

আধুনিক চিংড়ি পালন পদ্ধতির সুবিধাঃ

- কম জল এবং কম নিষ্কাশন
- কম খাদ্য এবং শক্তি
- উচ্চতর বায়োসিকিউরিটি জৈব নিরাপত্তা
- উচ্চ উৎপাদনশীলতা
- মাসিক আহরণ/মাছ ধরা/Harvest
- বছরব্যাপী উৎপাদন
- বেশি লাভ এবং নির্ভরযোগ্য চাষ

নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

- উন্নত সিস্টেম, অতিরিক্ত সতর্কতা: এই পদ্ধতিটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। তাই এই পদ্ধতিতে সাফল্য পেতে হলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, পুকুরে বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি জানানোর জন্য অ্যালার্ম ব্যবস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রশিক্ষণের গুরুত্ব: এই পদ্ধতিতে সাফল্য পেতে হলে শ্রমিকদের পুকুরের জীবাণু, শ্যাওলা, ক্ষুদ্র জীব এবং চিংড়ির খাদ্য চাহিদা সম্পর্কে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ক্ষমতা: এই পদ্ধতি শুরু করতে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির তুলনায় বেশি খরচ হয়। তাই লাভবান হতে হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদন করা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার:

উন্নত জাতের চিংড়ির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে "স্মার্ট ফার্মিং" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পদ্ধতিতে জল পুনর্ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন, এবং সেন্সর ব্যবহার করে জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বয়ংক্রিয় খাদ্য প্রদান ব্যবস্থা চিংড়ি চাষকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তুলবে।

স্মার্ট চিংড়ি চাষের সুবিধা:

- কার্যকারিতা বৃদ্ধি: কম শ্রম ও সময়ে বেশি উৎপাদন।

- ঝুঁকি হ্রাস: রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অন্যান্য ঝুঁকি কম।
- তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত: সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা যাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

ভারতের প্রেক্ষিতে:

ভারতের জলবায়ুর সাথে স্মার্ট চিংড়ি চাষ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। PMMSY উদ্যোগের মাধ্যমে ICAR-CIBA তে এই ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিকাশের কাজ চলছে, যা ভবিষ্যতে চিংড়ি চাষকে একটি লাভজনক পেশায় রূপান্তর করবে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ চিংড়ি চাষের জন্য বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাপড়া চিংড়ি

এ. পানিগ্রাহী, কে. পি. কুমারগুরু ভাসাগাম, পি.এস. শাইন আনন্দ, আই. এফ. বিজু এবং এম. কুমারন

চাপড়া চিংড়ি (*পিনিয়াস ইন্ডিকাস*) এক সময় এই চিংড়ি ছিল আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু ১৯৯০ সালের আগে, যখন থেকে বাঘা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক চাষ শুরু হল, তখন থেকেই যেন এই চিংড়ি আড়ালে চলে যায়। তবে চাপড়া চিংড়ির চাষ তো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে, আইসিএআর.-সিএমএফআরআই পি. ইন্ডিকাস এবং বাগদা চিংড়ি (পি. মনোডন) প্রজাতির জন্য বংশ বিস্তার এবং পোনা উৎপাদনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। এর ফলে নির্বাচিত পোনা দিয়ে বাণিজ্যিক ভাবে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাষীরা বেশি লাভের আশায় বাগদা চিংড়ির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ফলে চাপড়া চিংড়িআগের মতো গুরুত্ব পায়না। এরপর ১৯৯৪ সালে এশিয়া এবং ভারতে হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই ভাইরাস চিংড়ির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং এর ফলে চিংড়ি চাষে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস প্রতিরোধী বিদেশী প্রজাতি পি. ভেনামি ভারতে আনা হয়। বর্তমানে, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি চিংড়ি উৎপাদন হচ্ছে পি. ভেনামি প্রজাতির। ২০২২ সালে, বিশ্বে রেকর্ড ৯.৪ মিলিয়ন টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৩ শতাংশ ই চাষ করা। ভারতের চিংড়ি বাজারও দিন দিন বড় হচ্ছে। ২০২২ সালে এই বাজারের আকার ছিল ০.৮৫ মিলিয়ন টন। আশা করা হচ্ছে, ২০২৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছাবে।

স্থানীয় প্রজাতির গুরুত্বঃ চাপড়া চিংড়ি র সম্ভাবনা

বর্তমানে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা মেটাতে চিংড়ি চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এই শিল্প এখন এক ধরণের একঘেয়েমিতে আটকে যাচ্ছে। চিংড়ি চাষের জন্য আমরা মাত্র একটি বিদেশী প্রজাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এর ফলে বংশগত সমস্যা, নিম্নমানের পোনা এবং নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায়, আমাদের দেশীয় প্রজাতি পি. ইন্ডিকাস (চাপড়া চিংড়ি) একটি আশার আলো দেখাচ্ছে। এই চিংড়ি আমাদের জলের পরিবেশের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। ভারতের লবণাক্ত জলের চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান প্রতিষ্ঠান আইসিইআর-সিবা, বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। তারা বিশেষ ভাবে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর গুরুত্বারোপ করছে। তবে দুঃখের বিষয়, পি. ইন্ডিকাস প্রজাতির ক্ষেত্রে এখনও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব রয়েছে। এই প্রজাতির বংশগত গঠন এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের আরও জানতে হবে। চাপড়া চিংড়ি র উন্নত বংশ বৃদ্ধি এবং পোনা উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আরও গবেষণা এবং বিনিয়োগ

করার মাধ্যমে আমরা চিংড়ি চাষ শিল্পে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারি। এনএফডিবি এই ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা স্থানীয় চাপড়া চিংড়ি র কার্যক্ষমতা, বংশ মূল্যায়ন, পোনা উৎপাদন এবং বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক চাষ কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা "মেক ইন ইন্ডিয়া" ধারণার আলোকে বিদেশী প্রজাতির উপর নির্ভরতা কমাতে পারবো।

দেশীয় চিংড়ি চাপড়া চিংড়ি: প্র্যাসিফিক সাদা চিংড়ির সাথে তাল মিলাতে পারবে তো?

এতদিন আমরা চিংড়ি চাষের জন্য ভেনামি চিংড়ি এর উপর নির্ভর করে আসছি। কিন্তু এক নতুন প্রকল্প এখন দেশীয় চাপড়া চিংড়ি কে সামনে আনার চেষ্টা করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো কিভাবে দেশীয় চিংড়ির বংশ উন্নত করে তাদের আরও উৎপাদনশীল করা যায়। চাষীদের এই নতুন সম্ভাবনার সাথে পরিচিত করতে, ICAR-CIBA একটি চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেশীয় চিংড়ির চাষ প্রদর্শন করছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চাপড়া চিংড়িবন্দী অবস্থায় প্রজনন করতে পারে। এর ফলে আমরা উচ্চমানের, রোগমুক্ত পোনা পেতে পারবো। পোনা উৎপাদন পদ্ধতি আরও উন্নত করা হয়েছে এবং চাষীরাও এই চিংড়ি চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। চাপড়া চিংড়ি এর বহু-স্থানিক চাষ পরীক্ষা অনেক আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখাচ্ছে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি তা হল:

উচ্চ ঘনত্বের চাষের জন্য চাপড়া চিংড়ি প্রজাতির উপযুক্তি:

- চমৎকার বৃদ্ধির সম্ভাবনা: বিভিন্ন চাষ ব্যবস্থায় ভেনামি চিংড়ির মতোই ভালো বা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৮-২০ গ্রাম পর্যন্ত ওজন অর্জন করে।
- উচ্চ ঘনত্বের চাষের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ: এই প্রজাতি উচ্চ ঘনত্বের পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে।
- উৎপাদন ক্ষমতা: প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি বর্গমিটারে ২৫-৩০ টি পোনা মজুত করে প্রতি হেক্টরে ৩-৪ টন উৎপাদন সম্ভব, যা ভেনামি চিংড়ির সমান ঘনত্বের উৎপাদনের কাছাকাছি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে উচ্চতর উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও বেশি প্রদর্শনীমূলক পরীক্ষা চলছে।
- আরও ঘনত্বের সম্ভাবনা: আরও ঘনত্বের চাষের মাধ্যমে, এই প্রজাতি থেকে ৫-৭ টন পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে। ঘনত্বের উপর নির্ভর করে বৃদ্ধির ধরণ পরিলক্ষিত হয়েছে।
- লবণাক্ততা সহনশীলতা: ৫ থেকে ৪৫ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

- বহু-প্রজাতির চাষের উপযোগী: এই প্রজাতি মৎস্য যেমন কৈ, চ্যালা এবং পাবদা এবং অন্যান্য চিংড়ির সাথে বহু-প্রজাতির চাষ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত।
- প্রজনন সুবিধা: এই প্রজাতির প্রজনন সহজ তাদের প্রজন্ম সময়সীমা ছোট এবং বন্দী অবস্থায় প্রজনন সহজ হওয়ায় স্পেসিফিক প্যাথোজেন ফ্রি (SPF) বংশ তৈরি করা সম্ভব।
- বাজার মূল্য: অন্যান্য সাদা চিংড়ি, ভেনামি চিংড়ির এর মতো একই বাজার মূল্য রয়েছে।

আমাদের দেশের চিংড়ি, মানে চাপড়া চিংড়ির কথা ভাবুন। এর জিনগত উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা কী করতে পারি? আমরা এমন চিংড়ি তৈরি করতে পারি যা আরও ভালোভাবে বেড়ে ওঠে এবং রোগ প্রতিরোধ করে। এই উন্নত চিংড়ি আমাদের চিংড়ি চাষ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে, আরও বেশি বীজ এবং চিংড়ি উৎপাদন করবে। কে জানে, হয়তো একদিন আমাদের চাপড়া চিংড়ি বিদেশী ভেনামি চিংড়ির চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে! এবং যদি আমরা এসপিএফ স্টক সরবরাহ করতে পারি, তাহলে তো কথাই নেই!

কেন চাপড়া চিংড়ি আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, এটা আমাদের নিজস্ব, দেশীয় প্রজাতি। অর্থাৎ, এরা এখানকার পরিবেশের সাথে পুরোপুরি অভ্যস্ত। আর গবেষণায় যা দেখা যাচ্ছে, চাপড়া চিংড়ি চাষ আসলেই বেশ লাভজনক হতে পারে। এদের বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং বাজার দর - সব মিলিয়ে চাষীদের জন্য একটা ভালো সুযোগ। আর একটা কথা, কীভাবে এদের চাষ আরও ভালো এবং টেকসই হয়, সেই জন্য নিরন্তর গবেষণা চলছে। শুধু তাই নয়, আইসিএআর-সিআইবিএ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চাপড়া চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি স্থাপন করে এর সাফল্য পরীক্ষা করে দেখিয়েছে। অনেক ডেমো প্রজেক্টে এদের টিকে থাকার হার অনেক ভালো ছিল। এমনকি, বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে এদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও নজর কাড়ার মতো। আরও একটা আশ্চর্য তথ্য হলো, নার্সারিতে ২০-৩০ দিন চাষ করা বীজ থেকে যে চিংড়ি হয়, তারা অনেক বেশি শক্তপোক্ত এবং তেজি। এরা সহজে বেঁচে থাকে, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খাবারও ভালো হজম করে। তাই অনেক চাষী এখন পোনা মাছের পরিবর্তে নার্সারিতে চাষ করা বীজ ব্যবহার করতে আগ্রহী হচ্ছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বিদেশী প্রজাতির চিংড়ি আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকি হতে পারে। অন্যদিকে, চাপড়া চিংড়ি আমাদের নিজস্ব প্রজাতি হওয়ায় এদের চাষ পরিবেশের

জন্য নিরাপদ। তার উপর এদের জিনগত বৈচিত্র্য এত বেশি যে, এদের মাধ্যমে আমরা আরও উন্নত মানের চিংড়ি তৈরি করতে পারবো। সব মিলিয়ে বলা যায়, টেকসই চিংড়ি চাষের জন্য চাপড়া চিংড়ি একটি সেরা বিকল্প। প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের এই দেশী চিংড়ি চাপড়া চিংড়ি নিয়ে সিআইবিএ যে কাজ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়! আইসিএআর এবং এনএফডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে তারা এই চিংড়ি চাষ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং গুজরাট, সেখানকার চাষীদের সাথে মিলিত ভাবে কাজ করেছে। আর এই প্রচেষ্টার ফলাফল সত্যিই আশাপ্রদ! তারা দেখিয়েছে যে, ঠিক ভাবে চাষ করলে চাপড়া চিংড়ি প্রায় ২৪-২৫ গ্রাম ওজন পর্যন্ত বড় হতে পারে। আর টিকে থাকার হার? প্রায় ৯০%! এক হেক্টর জমি থেকে দেড় থেকে সাত টন পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে! আর এটা তারা বিভিন্ন ঘনত্বে চিংড়ি চাষ করে পরীক্ষা করে দেখিয়েছে, মানে কম চিংড়ি দিয়েও এবং বেশি চিংড়ি দিয়েও। চাষের সময়কাল ছিল ৮০ থেকে ১২৫ দিন। এছাড়া, টেকসই চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করেও তারা চমৎকার সাফল্য পেয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটারে মাত্র ১০ থেকে ১৫ টি চিংড়ি মজুত করা হয়েছিল। আর ফলাফল? ৯৫ থেকে ৯৮% চিংড়ি বেঁচে ছিল এবং প্রতি হেক্টরে প্রায় দেড় থেকে আড়াই টন উৎপাদন হয়েছিল! এই চাষ চলেছিল ৮০ থেকে ১২০ দিন। আরও কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য দিই। তারা লবণাক্ততার পরিমাণ ভেদে চিংড়ি চাষের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেছে। এবং প্রতি বর্গ মিটারে চিংড়ির সংখ্যা কমবেশি করে তারা সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। এবার আসি নার্সারির কথায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে শুধুমাত্র একবার চিংড়ি ছাড়া হয়, সিআইবিএ দেখিয়েছে যে নার্সারিতে প্রথমে চিংড়ি চাষ করে পরে বড় পুকুরে ছাড়লে উৎপাদন আরও বেশি হয়। কত বেশি, জানেন? প্রায় ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেশি! আরও একটা বিষয় হলো, চাপড়া চিংড়ি অক্সিজেনের জন্য অত ঝামেলা করে না। মানে, এরা কম অক্সিজেনেও বেঁচে থাকতে পারে। তাই এদের জন্য অত বেশি বায়ু দিতে হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, *Penaeus vannamei* চিংড়ির তুলনায় আমাদের এই চাপড়া চিংড়ি অনেক বেশি রোগ প্রতিরোধী। বিশেষ করে, হোয়াইট ফিকাল ডিসিজ এবং অন্যান্য রোগ এদের মধ্যে অনেক কম হয়। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে, প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ প্রায় ২৩০ টাকা হলেও, বাজারে এর দাম ২৮০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

এই দেশীয় প্রজাতির চিংড়ি চাষ কে উৎসাহিত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে মানসম্মত কার্যপদ্ধতি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি কার্যকর চাষ প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি অন্যান্য প্রজাতির সাথে এই চিংড়ি চাষ করার সুযোগ তৈরি করে।আইসিএআর- সিআইবিএ'র বিজ্ঞানীরা চাপড়া চিংড়ি র পুরো জিনোম সিকোয়েন্স এবং এ্যাসেম্বল করেছেন। ১.৯৩ জিবি এই জিনোম ১১১৭১ টি স্ক্যাফোল্ড এ স্থাপন করা হয়েছে, যার N50 মান ৩৪.৪ এমবি। চিংড়ির এই পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স মৎস্য চাষ বিজ্ঞানী এবং চিংড়ি প্রজননকারীদের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ। এটি

ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চিংড়ি বিকাশে একটি সূত্র হিসেবে কাজ করবে।সব মিলিয়ে বলা যায়, চাপড়া চিংড়ি চাষ আমাদের দেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। আর সিআইবিএ'র এই সকল অর্জন সত্যিই আমাদের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে

ভারতের উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন লবণাক্ততায় কম এবং উচ্চ ঘনত্বে চাপড়া চিংড়ির সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতার তুলনা

প্যারামিটার	কম ঘনত্ব	উচ্চ ঘনত্ব
চিংড়ি মজুদের ঘনত্ব (পিএল/বর্গ মিটার)	১০ - ২০	২৫ - ৪৫
জীবিত থাকার হার	৯০ — ৯৮	৭৫ - ৯৫
গড়ে সাপ্তাহিক বৃদ্ধি (গ্রাম)	১.৫ - ২.৫	১.০ - ১.৮
খাদ্য রূপান্তর অনুপাত	১.০ - ১.৪	১.৩ - ১.৮
চাষের সময়কাল (দিন)	৯০ - ১২০	৯০ - ১৩৫
প্রতি হেক্টর উৎপাদন (টন)	১.৪ - ৩.২	৩.৫ - ৭.০৯
মাছের ওজন(গ্রাম)	২২ - ৩০	১৭ - ২৩
প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ (টাকা)	১৮০ - ২১০/-	২১০ - ২৪০/-
বাজার মূল্য (টাকা)	৩৫০ - ৪৫০/-	২৮০ - ৪০০/-
রোগের প্রকোপ	নেই	৫ - ৮ %

ভারতের মোট সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির প্রায় ৭০% আসে চিংড়ি থেকে, যার মূল্য প্রায় ৪২,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু একটু ভাবলেই ভয় লাগে, এত বড় একটা শিল্প প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে আছে একটি বিদেশী চিংড়ি "প্যাসিফিক হোয়াইট শ্রিম্প" (*Penaeus vannamei*) এর উপর! এবার একটু হিসেব করি। এই এক প্রজাতির চিংড়ির উপর নির্ভর করে চলছে প্রায় ১০ লক্ষ টন চিংড়ি উৎপাদন!

প্রায় ২০ লক্ষ চাষির জীবিকা এবং পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এক প্রজাতির উপর এত বেশি নির্ভরতা তো ঝুঁকিপূর্ণ, তাই না?

সেই জন্যেই তো আইসিএআর- সিআইবিএ এগিয়ে এসেছে আমাদের স্বদেশী "চাপড়া চিংড়ি " (*P. indicus*) কে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য। "জিপ্পি" নামের এক চমৎকার প্রকল্পের মাধ্যমে তারা কাজ করছে এই চিংড়ির বংশগত উন্নয়নের জন্য। "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রকল্পের আওতায় পিএমএমএসওয়াই এই কার্যক্রমে অর্থায়ন করছে। লক্ষ্য একটাই - একক প্রজাতির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আমাদের দেশীয় চিংড়িকে আবার তার সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

চাপড়া চিংড়ি র বংশগত উন্নয়ন কার্যক্রমের সুবিধা:

- চাপড়া চিংড়ি র বংশগত উন্নয়ন মানে কিন্তু শুধু ল্যাবরেটরিতেই ঘোরাফেরা নয়! এখানে আমাদের বিজ্ঞানী, সরকার আর চিংড়ি চাষী - সবাই মিলে একসাথে কাজ করেন। একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন তথ্য এবং উন্নত পদ্ধতি বিনিময় করেন। ফলে খুব ছোট সময়ের মধ্যেই চমৎকার সব ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়।
- এই উন্নয়নের সুফল কিন্তু সরাসরি আমাদের চিংড়ি চাষীদের হাতেই পৌঁছে যায়! আরও উন্নত বংশ, আরও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা আরও বেশি চিংড়ি উৎপাদন করতে পারেন। ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়, সাথে সাথে সমৃদ্ধ হয় আমাদের দেশ।
- এই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চাপড়া চিংড়ি র প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি। এখন চিংড়ি আগের চেয়ে বেশি ডিম দিতে পারে, ডিমের গুণগত মান ও বেড়েছে। ফলে একই জায়গায় আরও বেশি চিংড়ি চাষ করা সম্ভব হচ্ছে, উৎপাদন ও হচ্ছে অনেক গুণ বেশি!

- বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা এমন সব চাপড়া চিংড়ি তৈরি করতে পারি যারা আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং পরিবেশের সাথে তাঁর বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশি। জলের গুণগত মান পরিবর্তন, তাপমাত্রার উত্থান-পতন, এমনকি পরিবহনের ঝুঁকি – সবকিছু এড়িয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারে এবং বেড়ে উঠতে পারে।

- শুধু তাই নয়, এই চিংড়ি অনেক কম সময়ে বড় হয়ে বাজারে যাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে চাষীরা কম সময়ে বেশি লাভ করতে পারেন।
- আরও মজার কথা হল, এই চিংড়িগুলো খাবার খেয়ে খুব ভালোভাবে শরীরে মাংস তৈরি করতে পারে। মানে কম খাবার খেয়েও তারা ঝটপট বড় হয়ে যায়। ফলে চাষীদের খরচ কমে, আর পরিবেশের উপরও চাপ কমে।
- আরও কিছু সুবিধার কথা বলি! বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে চাপড়া চিংড়ি কে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব। ফলে রোগের প্রকোপ কমে, চিকিৎসার খরচ কমে, চিংড়িও বেঁচে থাকে বেশি।
- এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এমন চিংড়ি পেতে পারি যাদের কার্যক্ষমতা থাকে একদম নির্ভরযোগ্য। মানে তাদের বৃদ্ধির হার, বেঁচে থাকার হার, এমনকি উৎপাদন - সবকিছুই থাকে প্রায় একইরকম। ফলে চাষীরা আগে থেকেই তাদের উৎপাদন পরিকল্পনা করতে পারেন এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চিংড়ি সরবরাহ করতে পারেন।
- সবচেয়ে বড় কথা হল, এই সব উন্নয়নের ফলে চিংড়ি চাষ হয়ে ওঠে আরও বেশি লাভজনক। বেশি উৎপাদন, কম খরচ, আর চিংড়ির বেশি দাম - সব মিলে চিংড়ি চাষীদের মুখে হাসি ফোটে!

উপসংহার

ভারতে ভেনামি চিংড়ি আসার পর চিংড়ি চাষে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু এক প্রকার চিংড়ির উপর নির্ভর করে আমরা আগাতে পারি না। আমাদের দেশীয় চাপড়া চিংড়ি র কথা ভাবতে হবে! এই চিংড়ির বংশ উন্নত করে আমরা চিংড়ি চাষে এক নতুন বিপ্লব আনতে পারি। এতে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, আর আমাদের দেশ আরও বেশি চিংড়ি রপ্তানি করতে পারবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, চাপড়া চিংড়ি র বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই এই চিংড়ির বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা এক সাথে অনেক কিছু অর্জন করতে পারব। আমাদের চিংড়ি চাষীরা আরও বেশি লাভবান হবেন, আর আমাদের দেশের অর্থনীতি হবে আরও সুদৃঢ়।

ভারতের সামুদ্রিক কাঁকড়ার চাষ : অবস্থান এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ

সি. পি. বালাসুব্রমনিয়ান, পি.এস. শাইন আনন্দ, জোস অ্যান্টনি, আই. এফ. বিজু, আর. আর. অরবিন্দ, এন. এস. সুধীর, এস. কান্নাপান এবং পি. পার্থ সারথি

ভূমিকা

সামুদ্রিক কাঁকড়া *সাইলা* প্রজাতির অন্তর্গত এবং এর উচ্চ বাজার দর এবং বিদেশে চাহিদা থাকার জন্য কাঁকড়ার এই প্রজাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অন্তঃ জোয়ার এবং উপ-যোগয়ার অঞ্চলে এবং ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ ইকো সিস্টেমে বসবাস করে। এটি ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে উপকূলীয় চাষের বৈচিত্রের জন্য অগ্রাধিকার যোগ্য প্রজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি সাধারণত জীবন্ত অবস্থায় বাজার জাত করা হয় এবং উৎকৃষ্ট স্বাদের জন্য জনপ্রিয়। নরম খোসার কাঁকড়া, ছোট সদ্য খোলস ত্যাগ করা কাঁকড়া সিঙ্গাপুর, চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, কোরিয়ার মতো এশিয়ান বাজার ছাড়াও ইউরোপ ও মার্কিন বাজারেও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ভারতে যদিও বহুবছর ধরে চিরাচরিত ভাবে চিংড়ির চাষ পদ্ধতিতে একটি আনুষঙ্গিক চাষ হিসাবে সামুদ্রিক কাঁকড়ার চাষ চলছে, এককভাবে সামুদ্রিক কাঁকড়ার চাষ ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়। জীবন্ত কাঁকড়ার রপ্তানি শুরু হওয়ার পরেই (Nasar and Noble 1995) এককভাবে কাঁকড়ার চাষ শুরু হয়েছিল। সামুদ্রিক কাঁকড়ার চাষের প্রধান উদ্দেশ্য হল জঙ্গল থেকে ছোট কাঁকড়ার বাচ্চা (২০০-৩০০ গ্রাম) সংগ্রহ করে চাষ করে মাংসের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। আগে সামুদ্রিক কাঁকড়া *সাইলা সেরেটা* কে *সাইলা ট্যাঙ্কুবারিকা* হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে CIBA ও RGCA নিশ্চিত করেছে যে ভারতীয় প্রজাতি যা পূর্বে *সাইলা ট্যাঙ্কুবারিকা* ছিল তা আদতে *সাইলা সেরাটা*।

ভারতের রিপোর্ট করা ২ টি প্রজাতির মধ্যে *সাইলা সেরাটা* সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয়। যদিও উভয় প্রকার কাঁকড়ার বাজার দর বেশি, তথাপি ব্যাপক ভাবে চাষ করা হয় শুধু *সাইলা* প্রজাতিকে কারন এই প্রজাতির বৃদ্ধির হার বেশি। এছাড়াও ডিম যুক্ত স্ত্রী সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ কাঁকড়ার (*সাইলা অলিভেসিয়া*) এরও উচ্চ বাজার চাহিদা আছে। ICAR-CIBA তে কাঁকড়ার জন্য একটি ছোট আকারের হ্যাচারি উৎপাদনে প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে যা ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সামুদ্রিক কাঁকড়ার হ্যাচারি পর্যায়ে কালচারের সময়কাল পেনেইড চিংড়ির থেকে অনেক বেশি। এই জন্য সামুদ্রিক কাঁকড়া নার্সারি লালন পালন আবশ্যক।

সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের অবস্থা

ভারতে সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের বর্তমান পরিস্থিতি চিংড়ি চাষের মত ব্যাপক নয়। সামুদ্রিক কাঁকড়া গত ১০ বছরের উৎপাদন তথ্য দেখলে দেখা যাবে যে উৎপাদন বা চাষের এলাকা সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। গত এক দশকে ২০১৬-১৭ সালে সবচেয়ে বেশি ৪,৪০৮ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। এই সময় চাষের সঙ্গে যুক্ত এলাকা ছিল অনেক বেশি (১৭,৪৭৮ হেক্টর)। যদিও পরীক্ষামূলক তথ্য অনুযায়ী উৎপাদন হার হল ২,০০০ কেজি/হেক্টর কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা গেছে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ১০০০ কেজিরও কম হয়। যাইহোক, গত ২ বছরের তথ্য এটা বলছে যে উৎপাদন ১,০০০ কেজি/হেক্টরে সামান্য বেশি হয়েছে।

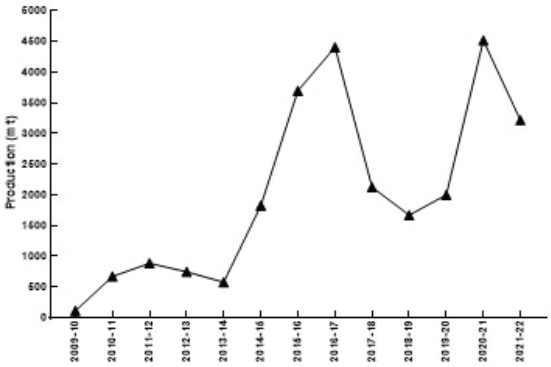

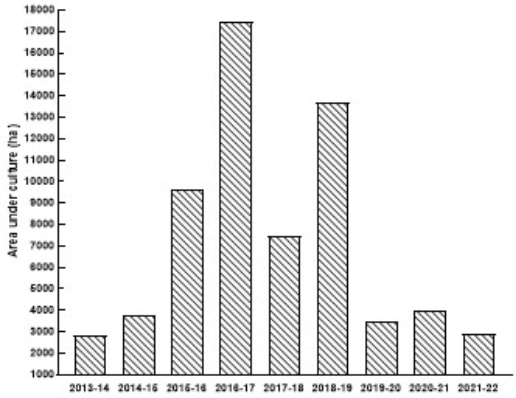

কাঁকড়ার প্রতিপালন ব্যবস্থা

যদিও কাঁকড়া চাষ অত্যন্ত লাভজনক, কিন্তু চাষের সময়কাল বেশি (৬-৮ মাস) ও বেঁচে থাকার হার কম এবং চিংড়ি চাষের তুলনায় কম আয়ের ফলে এই চাষে চাষীদের অনীহা দেখা দেয়। তাই এই চাষের উন্নতির জন্য এবং অর্থনীতিতে উন্নতি আনার জন্য ICAR-CIBA সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের জন্য ত্রিস্তরীয় চাষের পদ্ধতি তৈরি করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে নার্সারি পালন, পূর্ববর্তি পালন চাষ এর প্রতিপালন চাল এই তিন স্তরিয় চাষের ব্যবস্থা ছাড়াও ICAR-CIBA অন্যান্য মাছ ও চিংড়ির সাথে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মিশ্র চাষের একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ তৈরি করেছে। এই চাষের পদ্ধতি অধিকাংশ চাষীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

মেগালোপার নার্সারি পালন

সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের সময় এই নার্সারি কালচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ধরনের নার্সারি পালন করা হয় মেগালোপা ৩-৪ দিন বয়সী (২০-২১ দিনের লার্ভা পালনের পরে পাওয়া যায়) ফাইবার গ্লাস (FRP) বা সিমেন্টের ট্যাংকের ইনডোর হ্যাচারিতে বা পুকুর তৈরি করে হাপায় (নেট খাঁচায়) কাঁকড়া পালন করা যেতে পারে।

ট্যাঙ্কে নার্সারি পালন (ইনডোর সিস্টেম)

১-৫ ফিট ট্যাঙ্কে নার্সারি পালন করা হয়। মেগালোপা ৩-৪ দিন FRP ট্যাঙ্কে ১-২ নম্বর/লি পলিপ্রোপিলিন (PP) শেড নেট (কালো বা সবুজ রঙের) ৩০ সেমি×৩০ সেমি টুকরো করে কাটা হয় এবং তার মাঝখানে একটা ছোট পাথরের টুকরো বাধা হয় যাতে ফুলের মত দেখতে লাগে। এই কাঠামো গুলি নার্সারি ট্যাংক গুলিতে দেওয়া হয় যাতে লার্ভার মৃত্যুর হার কমে। পলিপ্রোপিলিন স্ট্রিপস গুলি (৬০ সেমি×১০ সেমি) ট্যাঙ্কে দেওয়া হয় যাতে মৃত্যুর হার কমানো যায়। মেগালোপাকে আর্টেমিয়া খাওয়ানো হয় (TL: ৪-৬ মিমি, ৭-৮ দিন বয়স) প্রতিদিন ২ বার করে। পর্যায়ক্রমে মেগালোপার ২ বার খাওয়ানোর সময় ১০০% জৈব বস্তুর কিমা করে ঝরঝরে (ঝিনুকের মাংস) করে খাওয়ানো যেতে পারে। নার্সারি পালনে আর্টেমিয়া ও ঝিনুকের মাংস মেগালোপাকে খাওয়ানোর সময় ৩০-৫০% জল পরিবর্তন করতে হয়। ছোট কাঁকড়ার বাচ্চা (BW: ০.৩-০.৫ গ্রাম, CW: ৫-১০ মিমি) ট্যাঙ্কে ১৫ দিন নার্সারি পালনের পর তোলা হয় এবং এই পদ্ধতিতে ২৫-৪০% বেঁচে থাকে।

পুকুরে মেগালোপার নার্সারি পালন

হাপাতে বেশি ঘনত্বের পালন

মেগালোপার নার্সারি পালন জোয়ার ভাটা এবং বাঁধ দেওয়া পুকুরে করা হয় যেখানে লবণাক্ততা ২০-৩৪ পিপিটি। মেগালোপা ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে বা জোয়ারের সমতল মাটিতেও পালন করা যেতে পারে। যেখানে জলের গভীরতা ন্যূনতম ০.৭ মিটার হবে। মেগালোপা মজুত করার ৭-১০ দিন আগে জৈব ও অজৈব সারের মিশ্রণ ব্যবহার করে পুকুরে দেওয়া হয় যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত অ্যালগাল ব্লুম এবং জু প্লাংটন তৈরি হয়। পুকুরে জলের গভীরতা ১.২ -১.৫ মিটার রাখা হয়। ০.৫-১.০ মিমি জালের আকার যুক্ত পলিথিন (PE) হাপা (নেট খাঁচা- ২মি×১মি×১মি) পলিপ্রোপিলিন দড়ি দিয়ে বাঁশ বা ক্যাসুয়ারিনাতে বেঁধে পুকুরে খাটানো হয়। হাপা এমন ভাবে বাঁধা হয় যেন পুকুরের নিচ থেকে ২০ সেমি উপরে থাকে। ২০-৩০ সেন্টিমিটারের একটি ভাসমান বোড জল স্তরের উপর রাখা হয়। উপরে খোলা হাপা থেকে ঢাকনা দেওয়া হাপা বেশি ব্যবহার করা হয়। লার্ভা যাতে না একে অপরকে খায় তার জন্য হাপাতে জীবন্ত সামুদ্রিক শৈবাল হাপাতে মজুত রাখা হয়। ৩-৪ দিনের মেগালোপা (৪-৬ মিলিগ্রাম) হ্যাচারির মধ্যে লবণাক্ততা (২-৪ ঘন্টা) লক্ষ্য করার জন্য অভ্যস্ত হয় এবং সন্ধ্যার সময় হাঁপাতে ৫০০ পিস/বর্গমিটার (১,০০০ পিস/লি) মজুত করা হয়। দিনে ৪ বার (সকাল ৮, দুপুর ১টা, বিকেল ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টা) হিসাবে মেগালোপাকে ২০০% হারে কিমা করা মাংস খাওয়ানো হয়।

লার্ভাকে প্রথম ৩ দিন (মেগালোপা প্রতি ৫টি করে) আর্টেমিয়া খাওয়ানো হয়। সপ্তাহে একদিন পুকুরের জলের ৩০ শতাংশ পরিবর্তন করতে হয়। কাঁকড়া ইনস্টার (BW: ০.৩-০.৫ গ্রা. CW: ৫-

১০ মিমি নার্সারি পালনের ১৫ দিনের পর পুকুর থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং সাধারণত ৫০-৬০ শতাংশ হারে বেঁচে থাকে। যেহেতু মেগালোপাকে উচ্চ ঘনত্বে মজুত করা হয় তাই ১৫ দিনের বেশি পালন করলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। এর জন্য উচ্চ ঘনত্বে মেগালোপা তখনই পালন করা হয় যখন কৃষকদের দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়ার ইনস্টার দরকার হয়।

গ্রো আউট: ছোট কাঁকড়া বাচ্চা থেকে বাজার যোগ্য আকারের কাঁকড়ার প্রতিপালন

চাষের পুকুরের আকার: আয়তাকার পুকুর যার আয়তন ২৫০ বর্গমিটার থেকে ১০,০০০ বর্গমিটার (১ হেক্টর) সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের জন্য উপযুক্ত। সাধারণত চিংড়ি চাষের পুকুরকে সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের পুকুর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও সামুদ্রিক কাঁকড়া ০-৪০ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে দেখা যায়। তবে ৩৪ পিপিটি এর ওপরে এবং ১০ পিপিটির নিচে লবণাক্ত যুক্ত পুকুরে চাষের জন্য কম উপযুক্ত বলে যানা যায়। যদিও গরমের মাস গুলিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সর্বোচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মিষ্টি জল মিশিয়ে এই লবণাক্ততা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয় (Balalio, 2005)। তবে কোস্টাল অ্যাকুয়াকালচার অথরিটি নিয়ম অনুযায়ী এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

কাঁকড়া চাষের জন্য জলের গভীরতা ১ মিটার বা তার বেশি ও প্রতিটি পুকুরে ১২ টি মাটির মাউন্ট থাকতে হবে। এই মাউন্ট গুলির উপরের পৃষ্ঠ জল থেকে কিছুটা ওপরে রাখতে হবে যাতে পুকুরের জল দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে এই মাউন্ট গুলিতে কাঁকড়া গুলি উঠে শ্বাস নেয় (চিত্র-৪)। কাঁকড়া পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য পুকুরগুলিকে অবশ্যই লাইলন জাল দিয়ে বেড়া দিতে হবে এবং এটি জলের লাইনের উপরে ন্যূনতম ৫০ সেমি প্রসারিত হওয়া দরকার। আরও বেড়ার ওপর দিকটা পলিথিন পেপার দেওয়া উচিত। নেটের নীচের দিকটা ১০ সেন্টিমিটার এর মত মাটির নিচে আটকে দেওয়া হয়।

পুকুর প্রস্তুতি: সাধারণত চিংড়ি চাষের পুকুর প্রস্তুতির পদ্ধতি অবলম্বন করেই সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের পুকুর তৈরি করা হয়। এই কাঁকড়া চাষের জন্য খুব সতর্কতামূলক এবং কঠোরভাবে পুকুর

প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। নেট দিয়ে বেড়াও মাউন্টের গুলি পুকুরে দেওয়া প্রয়োজন। পুকুর থেকে জল বার করে দিয়ে ১ সপ্তাহ রাখতে হবে যদি পুকুর থেকে জল বার করা না যায় তাহলে চা বীজের কেক বা পাউডার (১৫-৩০ পিপিএম) ব্যবহার করে পোকা মুক্ত করতে হয়। চিংড়ি চাষের মত কাঁকড়া চাষের পুকুর তৈরির পদ্ধতি লিখিতভাবে উল্লেখ্য কমই আছে। এখানে আমরা SEAFDEC গবেষকদের থেকে পাওয়া পদ্ধতি আমরা চাষীদের দিয়ে থাকি। এটি ফার্মের সাইট ও অবস্থান অনুসারে পরিবর্তন হতে পারে। চুন ও সার ব্যবহার করে পুকুরে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায়। চুন ব্যবহার করে পুকুরের জলের পরিকাঠামো ঠিক রাখা হয়। বিভিন্ন ধরনের চুন আছে যার মধ্যে কৃষি পাথুরেচুন, পোড়াচুন এবং হাইড্রেটের চুন উল্লেখযোগ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই চুন গুলির মধ্যে কৃষিচুন (Lime stone powder) সবচেয়ে ভালো এবং এটি প্রতি হেক্টরে ১ মেট্রিক টন হারে প্রয়োগ করা হয়। চিংড়ির পুকুরের জলে উদ্ভিদ কণার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অজৈব সার ব্যবহার করা হয় তবে কাঁকড়া চাষে জলের মধ্যে সারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নি। সামুদ্রিক শৈবাল এর সঙ্গে যখন কাঁকড়া চাষ করা হয় তখন সারের ব্যবহার খুব প্রয়োজন। বলা হয় ২৫ কেজি/হেক্টর হারে ইউরিয়া ও ৫০ কেজি/হেক্টর হারে অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার ব্যবহার করতে।

পরিবহন ও মজুত: সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষীরা চাষের জন্য ছোট ও মাঝারি কাঁকড়া অন্ত: জোয়ার ভাটার সমতল, মোহনা এবং ম্যানগ্রোভ এর উপর নির্ভর করে। হ্যান্ডলিং, প্যাকিং এবং পরিবহনের সময় কাঁকড়া গুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই কাঁকড়া গুলিতে সহজেই বেতের ঝুড়ি বা শক্ত কাগজের বাক্সে ম্যানগ্রোভের পাতা দিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কাঁকড়াদের মধ্যে মারামারি কমাতে কাঁকড়ার মোটা দাঁড়াগুলি বেঁধে দেওয়া হয়। বাতাসে সামুদ্রিক শৈবাল তুলা দিয়ে বা কাঠের বাক্সে করে প্যাকিং করা সামুদ্রিক কাঁকড়া ২-১৮ দিন বেঁচে থাকে (Vasudeo and Kewalramani, 1960)। কাঁকড়ার বাচ্চা গুলিকে একই আকারের ও সুস্থ সবল অবস্থায় মজুত করা উচিত। আলাদা আকার অর্থাৎ ছোট বড় হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। ছোট কাঁকড়া গুলিকে পুকুরে মজুত করা হয় সকাল বা রাতে যখন পুকুরের জলের তাপমাত্রা কম থাকে।

সামুদ্রিক কাঁকড়ার ঘনত্ব পুকুরে চিংড়ির ঘনত্বের থেকে কম হয়। কাঁকড়া মজুতে হারের উপর কাঁকড়ার বৃদ্ধি, বেঁচে থাকার হার এবং মোট কাঁকড়ার পরিমাণ নির্ভর করে তাই পুকুরে সাধারণত ০.৫-৩ পিস/বর্গমিটার হারে কাঁকড়া ছাড়া হয়। সামুদ্রিক কাঁকড়ার সঠিক মজুতের হার নির্ণয় করার জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফিলিপাইনে সামুদ্রিক কাঁকড়া *সাইলা সেরেটা* এবং *সাইলা ট্যাঙ্কুবারিকা* মিশিয়ে নিয়ে টিনো ইট এবং সহকর্মীগন (১৯৯৯) তিন ধরনের (০.৫, ১.৫ এবং ৩.০ কাঁকড়া/বর্গ মিটার) মজুতের হার রেখে কাঁকড়ার বৃদ্ধির হার পরীক্ষা করেন। যদিও বিভিন্ন ঘনত্বের মজুত কাঁকড়ার মধ্যে বৃদ্ধির হারের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কাঁকড়ার বিক্রির উপযুক্ত আকার, বেঁচে থাকার হার ও FCR কম ঘনত্বের মজুত কাঁকড়ার ক্ষেত্রে বেশি ছিল এবং তাহারা বলেন এই সামুদ্রিক কাঁকড়ার মজুতের ঘনত্ব ০.৫-১.৫ পিস/বর্গমিটার হওয়া দরকার। ICAR-CIBA এর কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রে কৃষকদের পুকুরে পালিত *সাইলা সেরেটা* বৃদ্ধির জন্য (চিত্র-৬) দেখানো হয়েছে।

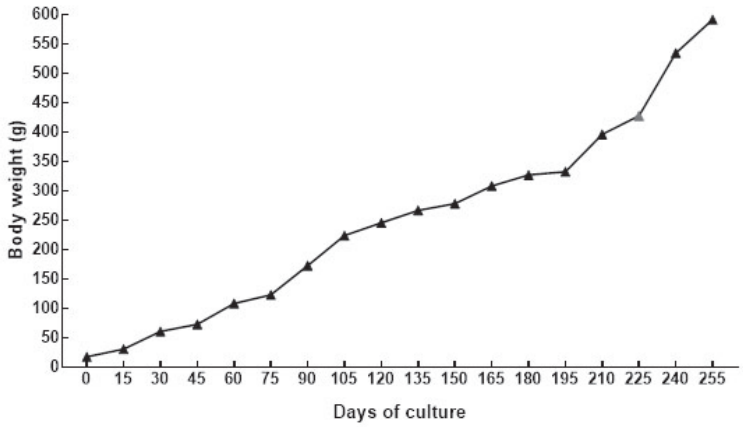

পুষ্টি এবং খাওয়ানো: সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ার সত্বেও এখনো পর্যন্ত কাঁকড়া চাষের জন্য সৃক্রিত খাবার তৈরি হয়নি। যদিও CIBA এবং CMFRI এর মত প্রতিষ্ঠানগুলির তৈরি কাঁকড়ার খাবার বাণিজ্য করনের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। জলজ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কারণ খাবার হলো ক্রাস্টেশিয়ান অ্যাকুয়াকালচার এর প্রধান ইনপুট। মোট খরচের ৪০-৫০ শতাংশ খরচ হয় খাবারে (Trino et al., 1999)।

সামুদ্রিক কাঁকড়ার খাদ্য উপাদানের মধ্যে প্রধান ক্রুস্টেসিয়া ও শামুক জাতীয় উপাদান যেখানে পাখনা ওয়ালা মাছ কাঁকড়ার খাবারে খুব কমই ব্যবহার করা হয়। কাঁকড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে পাওয়া কম খরচের প্রোটিনযুক্ত (কাঁচা মাছ, শামুক) মোট কাঁকড়ার ওজনের ৮-১০ শতাংশ হারে দেওয়া যেতে পারে। কাঁকড়াকে ২৫ শতাংশ হারে মাছ (কাঁচা মাছ) এবং ৭৫ শতাংশ হারে শামুক অথবা ঝিনুকের মাংস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। কাঁকড়ার মোট ওজন হিসাব করা যেতে পারে

মজুতের সময় কাঁকড়ার শরীরের ওজন ও বেঁচে থাকার হারের উপর অনুমান করে প্রতি ১৫ দিনে বেঁচে থাকার হার ৫ শতাংশ হিসাবে কমতে থাকে (Rodriguez et al., 2003)। সারণী-৩ নম্বরে খাদ্য হিসাব করার একটি উদাহরন দেওয়া হয়েছে। Rodriguez এবং ওনার সহকর্মীগণ 2003 সালে বলেন যে সামুদ্রিক কাঁকড়া কে কাঁচা মাছের থেকে শামুকের মাংস খাওয়ালে বৃদ্ধি বেশি হয়। সামুদ্রিক কাঁকড়ার বৃদ্ধি ৩ ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে যেমন শামুকের কিছু মাংস দিয়ে, কাঁচা মাছ দিয়ে এবং কোন খাবার ছাড়া। তাতে Christensen এবং ওনার সহকর্মীগন কাঁকড়ার বৃদ্ধির কোন বিশেষ পার্থক্য পাননি। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কাঁকড়ার পুষ্টির স্থর একটি উল্লেখ রাখে তা খাবার বা পুকুরের জলের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তাহারা আরো মনে করেন পুকুরে খাবার দেওয়ার ফলে পুকুরে জলের অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে এবং পুকুরে কাঁকড়া বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

	০-৩০ দিন	৩০-৬০ দিন	৬০-৮০ দিন	৯০ দিনের উপরে
খাওয়ানোর হার (%)	১৫	১০	৭	৫
আনুমানিক বেঁচে থাকা (%)	১০০	১০০	৭০	৭০

জলের গুণমানের বৈশিষ্ট্য

জলের গভীরতা ৮০-১০০ সেমি অবশ্যই রাখতে হবে। প্রতিদিন জল দিতে হবে। বসন্তের জোয়ারের সময় টানা ৩ দিন জল পরিবর্তন করতে হবে Redrigueiz et al., 2003 and Trino et al., 1999। প্রথম মাসে ৪০ শতাংশ, দ্বিতীয় মাসে ৫০ শতাংশ ও তৃতীয় মাসে সরল ৬০ শতাংশ জল পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিদিন জলের গুণগত মান লক্ষ্য করা উচিত। জলের গুণমানের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য গুলি ৪ নম্বর সারণীতে দেওয়া হয়েছে। যদি জলের গুণমান ঠিক থাকে তবে জলের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

জলের গুণমান	**পরিসর**
তাপমাত্রা (গিগ্রী সেন্টগ্রেড)	২৩-৩৩
স্বচ্ছতা (সিএম)	২৫-৪৫
পি এইচ	৭.৭-৮.৫
দ্রবীভূত অক্সিজেন (পিপিএম)	>৩
লবণাক্ততা (পিপিটি)	১০-৩৫
মোট খারত্ব (পিপিএম)	২০০
দ্রবীভূত অজৈব ফসফেট (পিপিএম)	০.১-০.২
নাইট্রেট এন (পিপিএম)	<০.০৩
নাইট্রাইট এন (পিপিএম)	<০.০১
অ্যামোনিয়া এম (পিপিএম)	<০.০১

ক্যাডমিয়াম (পিপিএম)	<০.০১
ক্রোমিয়াম (পিপিএম)	<০.১
তামা (পিপিএম)	<০.০২৫
সীসা (পিপিএম)	<০.১
বুধ (পিপিএম)	<০.০০০১
দস্তা (পিপিএম)	<০.১

পুকুর থেকে কাঁকড়া তোলা ও তার পরবর্তী পর্যায়

সাধারণত চাষের সময়কাল হলো তিন থেকে ছয় মাস এবং এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে কত ওজনের কাঁকড়া মজুত করা হয়েছে এবং বাজারের পছন্দ ও চাহিদার উপর। তবে চাষের সময়কাল ৬০ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, যদি বাজারে ২৫০ গ্রামের কাঁকড়ার চাহিদা থাকে। *সাইলা ট্রাঙ্কুবারিকা* চাষের সময় সীমা ১৫০ দিন হবে যদি কাঁকড়া ছাড়ার সময় কাঁকড়ার ওজন ২৫ গ্রাম হয় এবং তোলার সময় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম হবে। এই কাঁকড়ার ওজন ৮০০-১,০০০ গ্রাম হবে যদি চাষের সময় ৭ মাস করা হয়। *সাইলা সেরেটা* যদি ১ কাঁকড়া/বর্গমিটারে এই হারে মজুত করা হয় এবং প্রাথমিক ওজন ২৫ গ্রাম হয় তবে ১২০ দিনে সেই কাঁকড়ার ওজন হবে ২০০-৩০০ গ্রাম। যদি এই কাঁকড়ার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম করতে হয় তবে চাষের সময় আরো তিন মাস বাড়াতে হবে। জোয়ার ভাটার পুকুরগুলিতে স্লুইস দিয়ে জল ঢোকানো বা বাহির করার সময় কাঁকড়া সংগ্রহ করা যেতে পারে। যখন স্লুইস দিয়ে জল ঢোকে তখন কাঁকড়া গুলি জলের স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কেটে স্লুইস গেটের ধারে চলে আসে তখন স্কুপ নেট দিয়ে ধরা সহজ হয়। খাবার দেওয়া জাল, বাঁশের খাঁচা/ফাঁদ দিয়ে কিছু কিছু করে কাঁকড়া ধরা যায় পুকুর থেকে সব জল বার করে দিয়ে হাত দিয়ে কাঁকড়া ধরে হারভেস্ট সম্পূর্ণ করা হয়। কাঁকড়ার চলাফেরা বন্ধ করার জন্য এবং তাদের মধ্যে মারামারি বন্ধ করা এবং তাদের পা ভেঙে যাওয়ার আগে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেঁধে ফেলতে হবে। লাইলন বা পাটের দড়ি দিয়ে প্রথমে সামনের অংশ থেকে দড়ি চেলি পাগুলিতে আনা হয় তারপর চেলিপেড গুলিকে ভাঁজ করে নিয়ে দড়িটা কুন্ডলীর মতে সেই চেলি গুলি বেঁধে তারপর দড়ির দুই প্রান্ত পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ২ বার গিঁট দেওয়া হয়। এই জলজ কাঁকড়া গুলি পুরোপুরি ভাবে ধরা হয়ে গেলে এগুলি ফ্যাটেনিং এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এই বাঁধা কাকড়া গুলিকে প্রথমে নদীর পরিষ্কার জলে ধুতে হয় এবং তারপর বাঁশের খাঁচায় করে বাজারে পাঠানো হয় এগুলিকে তারা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ভেজা সামুদ্রিক শৈবাল বা ভেজা কাঠের সেভিং বা তুলো দিয়ে ভিজিয়ে রাখে সামুদ্রিক কাঁকড়া গুলিকে ঠান্ডা এবং ভেজা অবস্থায় রাখতে হয়। এই কাঁকড়া গুলিকে জীবন্ত অবস্থায় রপ্তানি করার জন্য প্রথমে পরিষ্কার সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে তারপর বায়ু চলাচলে উপযুক্ত থার্মোকল বাক্সে প্যাক করা হয়। এইভাবে চাষ করলে বেঁচে থাকার হার ৭০-৮০ শতাংশ

হয়ে থাকে সামুদ্রিক কাঁকড়া সাধারণত জীবন্ত অবস্থায় স্থানীয় বাজারে বা কাঁকড়া রপ্তানির বাজারে বিক্রয় করা হয়। বিক্রির উদ্দেশ্যে কাঁকড়া গুলিকে খুব বড় (১ কেজি বা তার বেশি), বড় (৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজির নিচে), মাঝারি (৩০০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রামের কম) এবং ছোট (২০০ গ্রাম থেকে ৩০০ গ্রামের কম) এই ভাগে ভাগ করে বিক্রি করা হয়। ডিম ভর্তি স্ত্রী কাঁকড়ার দাম বাজারে সবচেয়ে বেশি, ৩০০ গ্রামের চেয়ে ওজন বেশি জীবন্ত ও মাংস যুক্ত কাঁকড়া রপ্তানির জন্য গ্রহণযোগ্য। ৩০০ গ্রামের নিচের কাঁকড়া ও পা ভাঙ্গা কাঁকড়া গুলিকে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হয় যখন এই কাঁকড়া গুলিকে রপ্তানি করা হয় তখন মোটামুটি ২০ শতাংশ মৃত্যুর হার দেখা যায়। যখন বিমান পথে পাঠানো হয় তখন মৃত্যুর হার ৫-১০ শতাংশ হারে কমে যায়। ৯৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও ১৬-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি উপযুক্ত বায়ু চলাচল যুক্ত কাঠের বাক্সে সাজানো হয় তবে ৭ দিন পর্যন্ত মৃত্যুর হার কমিয়ে দেয় এবং পরিবহনের সময় ও মৃত্যুর হার কম হয়।

সামুদ্রিক কাঁকড়া কে ডিম যুক্ত করা (Fatenning)

কাঁকড়াকে ডিম যুক্ত করা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে (Pillai et al, 2008)। কিন্তু সামুদ্রিক কাঁকড়াকে ডিম যুক্ত কাঁকড়া করা দিয়েই কাঁকড়া চাষ শুরু হয়েছিল। ধরে আনা কাঁকড়াকে বাজারের জন্য উপযুক্ত করার জন্য খুব কম সময়ের জন্য চাষ করা হয় (Overton and Macintosh, 1997)। সামুদ্রিক কাঁকড়াকে ধরে পুকুরে বা খাঁচায় ২০-৩০ দিন রেখে দিয়ে ডিম যুক্ত করা হয়। এই ডিম যুক্ত করন কথাটি জনসাধারণের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ফেটেনিং শুধু কাঁকড়াদের মাংস পুরনও খোলস শক্ত করার জন্য চাষ করা হয়। ডিম যুক্ত স্ত্রী কাঁকড়া ততক্ষণ পালন করা হয় যতক্ষণ না তার ডিম পূরণ হয়। এই ফেটেনিং এর মাধ্যমে কাঁকড়ার মাংসের গুণ বাড়িয়ে কাঁকড়াকে বাজারের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

চাষের বর্ণনা

চাষের সময়কাল নির্ভর করে ছোটো যে কাঁকড়া মজুত করা হয় তার আকারের উপর সদ্য খোলস ছাড়া কাঁকড়া যেগুলিকে রপ্তানি করা যায় না সেই কাঁকড়াকেও পুকুরে মজুত করা যেতে পারে। এই পুকুরগুলি ছোট কাঁকড়া পালনের পুকুর (১০০-২০০ বর্গমিটার) থেকে ছোট হয়। এই পুকুরে ও ছোট কাঁকড়ার মতো চারিদিকে জাল ও বেরা দেওয়া হয়। এদের ওজনের ৫-১০ শতাংশ হারে শামুকের মাংস বা মাছ খাওয়ানো হয়। জলের উৎসের উপর নির্ভর করে ১৫ দিনে একবার জলের পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবে সারা বছর ধরে কাঁকড়া সংগ্রহ ও ফেটেনিং করা হয়। চিল্কা হ্রদে ১ মাসে সামুদ্রিক কাঁকড়ার প্রতি পালনের চিত্র দেওয়া হল ৫ নম্বর সারণীতে।

প্যারামিটার	মান
কোন কাঁকড়া মজুত হয়নি	৬১
উদ্ধার হয়নি	৫২
গড় প্রাথমিক ওজন	৫১৯
গড় চূড়ান্ত ওজন	৫২৯
গড় ওজন বৃদ্ধি শতকরা	২

যেখানে এই ফেটেনিং সিস্টেমে চাষ হয় সেখানে এই চাষে অর্থনৈতিকভাবে খুব লাভজনক। এই ফ্যাটেনিং করা কাঁকড়ার দাম বাজারে কেজি প্রতি ১০০-২০০ টাকা বেশি হয়। কাঁকড়া ফ্যাটেনিং করা হলে লাভ ১১০ শতাংশ বেড়ে যায়।

কাঁকড়ার মিশ্র চাষ পদ্ধতি

মিশ্র চাষ হল একটি দীর্ঘ চাষ পদ্ধতি যেখানে দুই বা তার বেশি প্রজাতি যারা একে অপরের ওপর খাদ্যের জন্য পরিপূরক, তাদের একসাথে চাষ করা হয়। এই চাষে বেশি উৎপাদন হয় একক চাষের থেকে। ভারতে সাধারণত নোনা জলের মিশ্র চাষে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে পুকুরে খাবার সরবরাহে হয় এবং যেখানে ৬-৭ মাস ধরে সাধারণভাবে আসা মাছ, চিংড়ি আর কাঁকড়া চাষ করে ৫০০ কেজি/হেক্টর হিসাবে উৎপাদন হয় (Lovatelli, 1990)। যদিও এই মিশ্র চাষে চিংড়ি চাষ ঠিক নয় কারণ চিংড়ির হোয়াইট স্পট রোগের জন্য অত্যাধিক সর্তকতা নিতে হয় যেটা খুব কম বার বা একদম জল পরিবর্তন না করা যেটা মিশ্র চাষে হয় না তাই নোনা নিচু জলাশয় যেখানে জোয়ার ভাটা হয় সেখানে চিংড়ি চাষ বিলুপ্ত হচ্ছে চিংড়ির বিকল্প হিসাবে সামুদ্রিক কাঁকড়া এইসব অঞ্চলের অর্থনীতিকে ধরে রাখে।

আমাদের মিশ্র চাষে ২১০ দিনে সামুদ্রিক কাঁকড়ার সাথে ভাঙ্গন মাছ এবং চেনস মাছ যদি ১.৫ শতাংশ/বর্গ মিটার এ মজুত করা হয় তবে দেখা যায় মোট উৎপাদন ৪,৫৩৩ এবং ৩,৬৯৪ কেজি/হেক্টর হয়। যেখানে মোট উৎপাদনের যথাক্রমে ৫৩.৬৯ শতাংশ এবং ৬০.৫৬ শতাংশ সামুদ্রিক কাঁকড়ার হয়। এই মিশ্র চাষে আঁশ যুক্ত মাছের জন্য তার ওজনের ২-৩ শতাংশ ভাসা খাবার ও সামুদ্রিক কাঁকড়ার জন্য তার ওজনের ৫-৮ শতাংশ হারে কাঁচা খাবার বা নিজেদের তৈরি খাবার খাওয়ানো হয়। আঁশযুক্ত মাছের মধ্যে ভাঙ্গন মাছের ওজন ২৪১.৫৫±২৬.৪৪ গ্রাম চেনস মাছের ওজন ২০০.৪৬±১১.৮২ গ্রাম এবং সামুদ্রিক কাঁকড়ার ওজন ৪০০-৪২০ গ্রাম হয়।

খাঁচায় চাষ

সাম্প্রতিক কালে খাঁচার কাঁকড়া চাষ চাষীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। ফ্যাটেনিং চাষ মূলত খাঁচায় হয় তবে কাঁকড়ার বৃদ্ধির চাষও খাঁচায় করা হয়। কাঁকড়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ছোট কাঁকড়া গুলিকে খাঁচায় একটি করে রেখে ৪-৬ মাস পালন করা হয়। এই খাঁচায় চাষের ফলে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়েরই দেখা যায়। এই চাষের সুবিধা হল সহজেই রক্ষণাবেক্ষণ এবং সহজ পরীক্ষা নিরীক্ষা আর এই চাষের

অসুবিধা হল এই খাঁচা কেনার জন্য অনেক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা। পুকুরের কাঁকড়ার চাষের ২ বার খাওয়ার দেওয়ার বদলে খাঁচায় দিনে একবার কাঁচা মাছ খাওয়ানো হয়। খাঁচায় কাঁকড়া গুলি কম নড়াচড়া করে এবং এর ওপর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ায় খোলসের উপর শ্যাওলা হয় যার ফলে খোলস ত্যাগে সমস্যা হয়। ফ্যাটেনিং চাষে নরম খোলস যুক্ত বা বাদ দেওয়া কাঁকড়া গুলিকে খাঁচায় এক একটি করে রেখে খাওয়ানো হয় যতক্ষণ না খোলস শক্ত অথবা মাংস পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কমলা, লাল ডিম যুক্ত স্ত্রী কাঁকড়া গুলির স্থানীয় বাজারে বা রপ্তানির বাজারে বেশি দাম হয়। একটি নরম ফোলা যুক্ত কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এরপর ২০-২৫ গ্রাম ওজন বারে এবং বছরে ৯-১০ মাস এই ভাবে চাষ করা হয় এবং এক একটি বারের ওজন ২০-৩০ দিন সময় লাগে।

জলে ডোবানো খাঁচার ব্যবস্থা

সারাদিন পুকুরের জলে উপরে ভেসে থাকা খাঁচা গুলি গরমের সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে কাঁকড়ার ওপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করে শুধু সূর্যের তাপ কাঁকড়াকে দুর্বল করে না এই তাপের ফলে কাঁকড়ার উপর শ্যাওলা সৃষ্টি হয় যার ফলে বাজারে কাঁকড়ার দাম কমে যায়।

এই নিমজ্জিত খাঁচাগুলি পাম্পের সাহায্যে জলে ডোবানো হয় এই ব্যবস্থাতে পিভিসি পাইপ গুলি খাঁচা গুলিকে ভাসতে সাহায্য করে এবং এই পাইপের একধারে পাম্প লাগানো থাকে এই ব্যবস্থায় পাম্পের সাহায্যে পাইপে জল ঢোকানো বা বার করানো হয় এবং খাঁচা গুলি ডোবানো এবং ভাসানো হয় এই খাঁচাগুলি বেশি সময় জমানো ডোবানো থাকে কেবল খাবার দেয়ার সময় তোলা হয়।

জলে মনোসেক্স চাষ

সামুদ্রিক কাঁকড়া আকার বিভিন্ন হওয়ার জন্য মিশ্রভাবে কাঁকড়া চাষ না করে যদি কেবল পুরুষ কাঁকড়া চাষ করা হয় সেটি বেশি লাভজনক হয়। সামুদ্রিক স্ত্রী কাঁকড়া থেকে পুরুষ কাঁকড়া, বেশি বড় হয়। একক স্ত্রী কাঁকড়া, একক পুরুষ কাঁকড়া ও মিশ্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ চাষ করে দেখা গেছে ১৪৩ দিন পর মিশ্রভাবে চাষ করে কাঁকড়ার গড় ওজন একক ভাবে চাষ করা স্ত্রী কাঁকড়ার চেয়ে বেশি। বেঁচে থাকার হার একক ভাবে চাষ করা স্ত্রী কাঁকড়ার বেশি মিশ্রভাবে চাষ করা কাঁকড়ার চেয়ে।

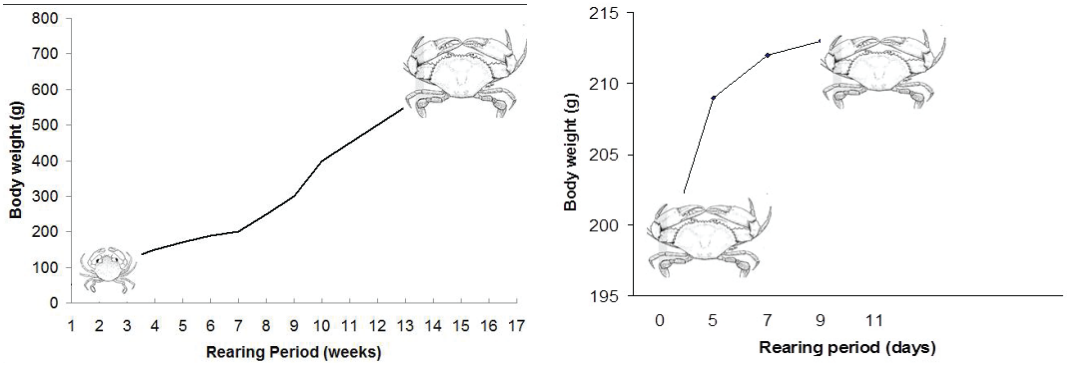

এ- চিত্রে ছোট কাঁকড়াকে বড় হওয়া ও বি- চিত্রে কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং এর চিত্র থেকে বোঝা যায় এদের আকারের কোন পরিবর্তন হয়নি দুই ক্ষেত্রে

সংখ্যা	আইটেম	পরিমাণ টাকা
১	**মূলধন ব্যয়**	**২৫,০০০**
২	**পৌন: পুনিক ব্যয়**	
	নিরমূল	৬,০০০
	চুন এবং সার	৬,০০০
	চারার দাম	৩০,০০০
	পরিবহন খরচ	৫,০০০
	ফিড	১,৮০,০০০
	জ্বালানি এবং বিবিধ	৫,০০০
	মজুরি	৮০,০০০
	উপ মোট	**৩,১২,০০০**
	মোট ব্যয় (১ + ঘন্টা)	৫৬,২০০০
৩	উৎপাদন কেজি	২০০
৪	**মোটা আয় (প্রতি কেজি ৪০০ টাকা)**	**১৬,০০,০০০**
৫	নীট লাভ (৪-১)	১০,৩৮,০০০
৬	বেনিফিট কষ্ট রেশিও	১.৮৪৬৯৭৫০৯

উপসংহার

মাছ চাষের ক্ষেত্রে সলমন চাষের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে চিংড়ি চাষের উন্নতশীল দেশগুলি তুলনা যোগ্য। এই চাষ গুলি সাধারণত কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই মাছ চাষ দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলে। সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষ গ্রামের মাছ চাষের মধ্যে অন্যতম যা ক্রান্তীয় অঞ্চলের গ্রাম গুলির উন্নতির জন্য বিশেষ অবদান রাখে বর্তমানে কাঁকড়া চাষে প্রকৃতি থেকে কাঁকড়া ধরে বাজারের আকারে করা হচ্ছে যদিও সেখানে অনেক অসুবিধা আছে উদাহরণস্বরূপ বেড়ে ওঠার জন্য ব্যবহার করা প্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকে সামুদ্রিক কাঁকড়া চাষের সুবিধা হল সমুদ্র থেকে ছোট কাঁকড়া পাওয়া, কম রোগ হওয়া এবং উন্নত দেশগুলিতে উপকূলীয় বাসিন্দাদের মেশার সুযোগ এর অর্থনৈতিক সুবিধা হয়।

বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নোনাজলের মাছ চাষে উন্নতির সম্ভাবনা

এম. কৈলাসাম, আর. জয়কুমার, অরিত্র বেরা, ববিতা মন্ডল, ড্যানি থমাস, এম. মাকেশ,
টি. সেন্থিল মুরুগান, আর. সুব্বুরাজ, জি. থিয়াগারাজন, ডি. রাজা বাবু এবং কে. কারাইয়ান

ভূমিকা

আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, উড়িষ্যা, কর্ণাটক এবং গোয়ার নোনা জলের এলাকায় অনেক যুগ ধরেই ছোট ছোট চিংড়ি ধরে চাষ করার প্রথা চলে আসছে। ভেরি, পোখালি, ঘেরী, খার, গাজনি - এই সব নামেই আমরা পরিচিত। এই প্রথাগত পদ্ধতি ছাড়াও নোনা জলে মাছ চাষের জন্য আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯১১ সালে, যখন জেমস হর্নেল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই বিষয়ে প্রস্তাব দেন। তার পর থেকে লেগুন ব্যবহার করে নোনা জলের মাছ চাষ শুরু হয়, যেখানে বেলে, ভাঙ্গন এবং অন্যান্য স্থানীয় মাছ চাষ করা হত। ভেটকি, ভাঙ্গন, চানোস, মুক্তগাছা - এই সব নোনা জলের মাছের চাহিদা বাজারে ছিল বেশ ভালো। এরপর ১৯৯৭ সালে আইসিএআর-সিআইবিএ (ICAR-CIBA) বিজ্ঞানীরা এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেন - তারা প্রথমবারের মত কৃত্রিম ভাবে ভেটকি মাছের প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হন। এই সাফল্যের পর চেন্নাইয়ের মুতুকাডু গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম "পাখনা যুক্ত মাছের হ্যাচারি"।

ভেটকি মাছের চাষ যাত্রা শুরু হয়েছিল ICAR-CIBA হাত ধরে। তারা যখন ভেটকি মাছের চারা উৎপাদন এবং পালনের পদ্ধতি আবিষ্কার করে, তখন ২০০০ সালের দিকে এই জ্ঞান তারা রাজীব গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাকোয়াকালচারকে হস্তান্তর করে। এর ফলে হ্যাচারিতে উৎপাদিত ভেটকি মাছের চারা সরাসরি চাষিদের কাছে পৌঁছে যাওয়া শুরু হয়, যা ভারতে ভেটকি মাছ চাষের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাষিরাও উৎসাহের সাথে এই নতুন পদ্ধতিতে ভেটকি মাছ চাষ করা শুরু করেন।

শুধু ভেটকি নয়, ২০১৫ সালে ICAR-CIBA চানোস মাছের (মিল্ক ফিস) প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়। এর পর থেকে চানোস মাছের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয় ভারতে। এছাড়াও ICAR-CIBA নোনা টেংরা মাছের প্রজনন ও চাষের ক্ষেত্রেও সাফল্য পেয়েছে, যা বাজারে ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে। ২০১০ সালে যখন কেরালা সরকার "কারিমিন" কে রাজ্য মাছ হিসেবে ঘোষণা করে, তখন এই মাছের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। বর্তমানে এই মাছের চাহিদা এত বেশি যে প্রতি কেজি "কারিমিন" ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। "আঁশ ভাঙ্গন" - এই ছোট্ট মাছটির খাদ্যশৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকলেও এর দাম বেশ চড়া। কারণ আমরা এখনও এই মাছের বীজ নদী থেকে ধরে এনেই চাষ করি। কিন্তু কেরালার মতো রাজ্যে নদী থেকে মাছের বীজ সংগ্রহের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা

জারি করায় "আঁশ ভাঙ্গন" মাছের চাষ কমে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান করতে ICAR-CIBA প্রযুক্তির ব্যবহারে "আঁশ ভাঙ্গন" মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

শুধু "আঁশ ভাঙ্গন" নয়, ICAR-CIBA অন্যান্য সুন্দর ও দামি মাছ, যেমন পায়রাতালি, চাঁদ মাছ, কমলা ক্রোমাইড, ক্রিসেন্ট পার্চ, পার্লস্পট ইত্যাদির প্রজনন ও চাষের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এই সব মাছ ঘরেই চাষ করে ছোট চাষিরা এবং মহিলারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবেন।

নোনাজলের মাছের বীজ উৎপাদন

১.১ ভেটকি মাছ, *Lates calcarifer*

ভেটকি সেন্ট্রোপমিডি গোত্রের একটি প্রাণী, এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আরব সাগর, চীন, তাইওয়ান, পাপুয়া নিউগিনি, উত্তর অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল পর্যন্ত পাওয়া যায়।

শ্রেণীবিন্যাস:

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, শ্রেণী অ্যান্টিম্পটেরিগি, বর্গ-পার্সিফর্মিস, গোত্র- ল্যাটিডি, গণ-লেটস্ প্রজাতি- ক্যালক্যারিফার

"ভেটকি" - এই নামটি শুনলেই জিভে জল চলে আসে! প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে আরব সাগর, চীন, অস্ট্রেলিয়া - সব জায়গাতেই এই মাছের দেখা মেলে। আমাদের দেশে "ভেটকি" নামেই পরিচিত হলেও এশিয়ায় একে "সিবাস" এবং অস্ট্রেলিয়ায় "বারামুন্ডি" বলা হয়। ১৯৯৭ সালে ভারত এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে - প্রথমবারের মত কৃত্রিম ভাবে "ভেটকি" মাছের প্রজনন ঘটানো সম্ভব হয়। এরপর থেকে "রিসার্কুলেশন অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম" ব্যবহার করে সারা বছর ধরে "ভেটকি" মাছের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।প্রথমে প্রজননক্ষম মাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে রাখা হয়। সেখানে ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট লার্ভাগুলোকে বিশেষ ভাবে তৈরি খাবার খাইয়ে আঙ্গুলের সমান বড় করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি কে আরও সহজ করে তুলতে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন "ব্রুডস্টক উন্নয়ন", "পরিপক্কতা", "প্রজনন", "লার্ভা পালন" ইত্যাদি বিষয়ের উপর।"ভেটকি" মাছ সাধারণত নদীর মোহনায় থাকে যেখানে মিষ্টি ও নোনা জলের মিশ্রণ ঘটে। ডিম

ছাড়ার জন্য তারা সমুদ্রে যায়। কিন্তু হ্যাচারিতে সমুদ্রের মতো পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন কীভাবে কৃত্রিম ভাবে "ভেটকি" মাছের ডিম পরিপক্ক করে তা থেকে নতুন জীবন তৈরি করা যায়।

CIBA-তে "ভেটকি" মাছের ডিম পরিপক্ক করার জন্য একটি বিশেষ ধরণের হরমোন ব্যবহার করা হয় যার নাম "লুটিনাইজিং হরমোন রিলিজিং হরমোন"। দুই বছরের বেশি বয়সী পুরুষ "ভেটকি" এবং এক বছরের বেশি বয়সী স্ত্রী "ভেটকি" সাধারণত প্রজননের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যদি তারা সঠিক সময়ে প্রজননের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে তাদের শরীরে LHRH হরমোন (50-100µg/ kg) প্রয়োগ করা হয় যাতে তাদের ডিম ও শুক্রাণু তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১.২ মিল্কফিশ, *Chanos chanos*

"মিল্কফিশ" নামের এক ধরণের নোনা জলের মাছ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খুবই লোভনীয় খাবার। এই মাছ প্রায় ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে এবং প্রায় ১৪ কেজি ওজন পর্যন্ত বড় হতে পারে। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এই মাছ পাওয়া যায় এবং প্রতিটি রাজ্যের ভাষা অনুযায়ী এর নাম ভিন্ন। যেমন - তামিল ভাষায় "পাল মীন", তেলেগুতে "পালা বোঁধা", মালয়ালম ভাষায় "পুমিন" কন্নড় ভাষায় “হুমেনু” , গোয়ায় “গোলসি” এবং ওড়িয়াতে “সেবা থাইঙ্গা” ইত্যাদি।

"মিল্কফিশ" একটি তৃণভোজী মাছ। অর্থাৎ এরা জলে ভাসমান শৈবাল এবং পচা গাছপালা খেয়ে বেঁচে থাকে। চাষের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ধরণের খাবার দেওয়া হয়। এই মাছ মিষ্টি ও নোনা - উভয় জলেই বেঁচে থাকতে পারে। এটি ০-১০০ পি.পি.টি. পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে এবং বাস করতে পারে, তবে ০.৫-৪০ পি.পি.টি. এর মধ্যে বৃদ্ধি সব থেকে ভালো হয়। তবে চাষের জন্য হালকা নোনা জল বেশি উপযোগী। মাত্র ৫-৬ মাসের মধ্যেই এই মাছ প্রায় আধা কেজি ওজনের হয়ে যায়। দেখতে এবং খেতে প্রায় "ইলিশ মাছের" মতো হওয়ায় অনেকে একে "দক্ষিণের ইলিশ" বলে থাকে। খুব কম

খরচে এই মাছ চাষ করে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। কম প্রোটিন যুক্ত দানা খাবার খাইয়ে, প্রতি কেজি তে ৮০-৯০ টাকা উৎপাদন খরচ করে, মিল্কফিশ উৎপাদন করা যেতে পারে।

শ্রেণীবিন্যাস:

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, বর্গ-গণরিঞ্চিফর্মিস, গোত্র- চ্যানিডি, গণ-চ্যানোস, প্রজাতি- চ্যানোস্

২০১৫ সালে ICAR-CIBA একটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে - তারা প্রথমবারের মত "মিল্কফিশ" মাছের কৃত্রিম প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়। এর ফলে "মিল্কফিশ" মাছের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।এই পদ্ধতিতে প্রথমে ৬ বছরের বেশি বয়সী "মিল্কফিশ" মাছ সংগ্রহ করে তাদের বিশেষ পরিচর্যায় রাখা হয়। পরিপক্ক "মিল্কফিশ" মাছের শরীরে LHRH-A নামক এক ধরণের হরমোন প্রয়োগ করে তাদের ডিম ও শুক্রাণু তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বীজ হ্যাচারিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরে তা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।ICAR-CIBA এই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে চাষিদের ধারণা দেওয়ার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

১.৩. আঁশ ভাঙ্গন, *Mugil cephalus*

"আঁশ ভাঙ্গন" - এই মাছটি প্রায় প্রতিটি দেশেই মেলে। বিশেষ করে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, ভূমধ্যসাগর এলাকা, তাইওয়ান, জাপান এবং হাওয়াই - এই সব জায়গায় "আঁশ ভাঙ্গন" মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবার।এই মাছের একটি বিশেষ গুণ হল এরা যেকোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সমুদ্রের নোনা জলে, নদীর মিষ্টি জলে - সর্বত্রই এরা বেঁচে থাকতে পারে। জল যদি একটু ঘোলা হয়, লবণাক্ততা কম বেশি হয়, অক্সিজেন একটু কম থাকে - "আঁশ ভাঙ্গন" মাছের কোনো কিছুতেই কোনো আপত্তি নেই!

শ্রেণীবিন্যাস:

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, শ্রেণী টেলিওস্টেই, বর্গ-মুগিলিফর্মিস্, গোত্র- মুগিলিডি, গণ- মুগিল প্রজাতি- সেফালাস্

"আঁশ ভাঙ্গন" শুধু খেতে সুস্বাদু নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হতে পারে। তাইওয়ান এবং জাপানে এই মাছের ডিম থেকে "বোর্টাগা ক্যাভিয়ার" নামের এক ধরণের সুস্বাদু ও দামি খাবার তৈরি করা হয়। ভারতের বাজারেও এই মাছের চাহিদা বেশ ভালো।

"আঁশ ভাঙ্গন" মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী কারণ এরা যেকোনো পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং তৃণভোজী হওয়ায় এদের খাবারের জন্য বেশি খরচ করতে হয় না। ICAR-CIBA গত কয়েক বছর ধরে "আঁশ ভাঙ্গন" মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করে আসছে এবং কিছু আগ্রহী চাষিদের কাছে এই বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।

আঁশ ভাঙ্গনের পুরুষ ২-৩ বছর বয়সে, ২৫০-৩০০ মিমি প্রমাণ দৈর্ঘ্যের মধ্যে পরিপক্ক হয় এবং স্ত্রী মাছ কিছুটা বড় আকারে ৩-৪ বছরে, ২৭০-৩৫০ মিমি প্রমাণ দৈর্ঘ্যে পরিপক্ক হয়। স্ত্রী মাছের পরিপক্কতার সময়টি ডিমের বায়োপসি করে দেখা হয়। এটি ডিম ছাড়ার সঠিক সময় বুঝতে এবং উপযুক্ত হরমোন দিতে সাহায্য করে। আঁশ ভাঙ্গনের ৮০- ৯০ মাইক্রন আকারের একটি ডিম্বাণু প্রাথমিক ডিম্বাণু পর্যায়ে, ১১০-১২০ মাইক্রন আকারে- প্রাথমিক ডিম্বাণু সামান্য উন্নত পেরিনিউক্লিয়ার স্তরে থাকে। ১৪০-১৫০ মাইক্রন আকারের ডিম্বাণু গুলি কর্টিকাল অ্যালভিওলি পর্যায়ে থাকে। আরও, ১৮০ মাইক্রন এর উপরের ডিম্বাণুগুলি তে কুসুম তৈরি হতে দেখা গেছে। ডিম্বাণুর সম্পূর্ণ পরিপক্কতা আনার জন্য, এই পর্যায়টিতে দেহে LHRHa ঢোকানোর উপযুক্ত সময়। আঁশ ভাঙ্গনে, ৬০০ মাইক্রন ব্যাসের একটি ডিম্বাণু সফল প্রনদিত প্রজননের জন্য সব থেকে বেশি উৎকৃষ্ট।

১.৪. ম্যানগ্রোভ রেড স্ন্যাপার, *Lutjanus argentimaculatus*

"ম্যানগ্রোভ রেড স্ন্যাপার" - নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই মাছ নদী ও সমুদ্রের মিষ্টি জলের এলাকায় থাকতে ভালোবাসে। ছোট বেলায় তারা নদীর মোহনায় ঘুরে বেড়ায়, আর বড় হলে চলে যায় গভীর সমুদ্রে। কখনো কখনো তারা এত গভীরে চলে যায় যে সেখানে পৌঁছাতে ১০০ মিটারের বেশি গভীর জলে ডুব দিতে হয়! এই মাছের রঙ অনেকটা সবুজ বাদামী এবং লালের মিশ্রণ। যেসব "রেড স্ন্যাপার" গভীর সমুদ্রে থাকে তাদের রঙ অনেকটা লাল হয়। ছোট মাছগুলোর দেহে সাদা ডোরাকাটা নকশা থাকে এবং লেজের কাছে নীল রেখা থাকে।"রেড স্ন্যাপার" প্রধানত ছোট মাছ এবং চিংড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। এই মাছ খেতে খুবই সুস্বাদু এবং সারা বিশ্বেই এর চাহিদা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই মাছ এখন আর আগের মত সহজে পাওয়া যায় না। সাধারণত বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরার জাল এবং কাঁটার মাধ্যমে এই মাছ ধরা হয়। যেহেতু এই মাছের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই এখন অনেক দেশেই কৃত্রিম ভাবে এই মাছ চাষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রেণীবিন্যাস:

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, উপ-পর্ব ভার্টিব্রাটা, শ্রেণী সিসেস্, উপ শ্রেণী অ্যান্টিম্পটেরিগি বর্গ-টেলিওস্টেই, গোত্র-লুটজানিডি, গণ-লুটজেনাস্, প্রজাতি- আর্জেন্টিম্যাকুলাটাস্

"রেড স্ন্যাপার" মাছ যদি আমরা কৃত্রিম ভাবে প্রজনন করাতে চাই, তাহলে তাদেরকে প্রথমে নোনা জলে রাখতে হবে। এরপর তাদের শরীরে এক ধরণের হরমোন (hCG) প্রয়োগ করা হয় যার ফলে তারা ডিম ও শুক্রাণু ত্যাগ করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "বহিঃনিষেক"।

একটি স্ত্রী "রেড স্ন্যাপার" প্রচুর ডিম দিতে পারে - প্রায় ৫ লাখ! পুরুষ মাছের তুলনায় স্ত্রী মাছ একটু বড় হলে তারা প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়। ডিম থেকে যে ছোট্ট বাচ্চা বের হয় তাকে বলা হয় "লার্ভা"। শুরুতে এই লার্ভাগুলোকে বিশেষ ধরণের খাবার খেতে দিতে হয় যেমন - রোটিফার, আর্টেমিয়া ইত্যাদি। প্রায় ৪০ দিন পর তারা একটু বড় হলে তাদের সাধারণ খাবার দেওয়া শুরু করা যায়।

১.৫ মুক্তগাচ্ছা, *Etroplus suratensis*

মুক্তগাছা, ভারতের বিভিন্ন উপকূলীয় রাজ্যে জনপ্রিয় একটি মাছ; যেটি খাবার জন্য ও বাড়ির সুন্দর্য বাড়ানোর জন্যে ব্যাবহার করা হয়। এরা ভারতিয় উপদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়। কম থেকে বেশি যে কোনো লবণাক্ততায় এরা বেচেঁ থাকতে পারে, তাই সাদুজল বা নোনা জলে এরা সহজেই চাষযোগ্য একটি প্রজাতি।

শ্রেণীবিন্যাস:

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, শ্রেণী অ্যান্টিম্পটেরিগি, বর্গ-পার্সিফর্মিস, গোত্র চিচলিডি, গণ-এট্রোপাস্, প্রজাতি- সুরাটেন্সিস্

মুক্তগাছা সর্বভুক হওয়ায়, চাষ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং লাভজনক। এমনকি ছোট পুকুরেও এই মাছ চাষ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। কেরালায় "মুক্তগাছা" মাছ চাষ একটি প্রচলিত ছোট আকারের খাঁচা ভিত্তিক চাষের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ২ মিটারের জালের তৈরি খাঁচায় মুক্তগাছা কে প্রতি ঘন মিটারে ২০০ টি করে মজুত করে, বাণিজ্যিক খাবার (অশোধিত প্রোটিন-20%) ব্যবহার করে ২০০-২৬০ দিনে ২৬ কি.গ্রা./ঘনমিটার উৎপাদন করা যায়। অতি সম্প্রতি, রাজ্যের মৎস্য বিভাগের সহায়তায় কেরালার অনেক কৃষক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG's) ছোট খাঁচায় (২-৩ ঘনোমিটার) এবং পুকুরে মাছ চাষের সাথে জড়িত। এই পদ্ধতিতে কম জায়গায় অনেক মাছ চাষ করা সম্ভব হয়। কেরালার মৎস্য বিভাগ এই ধরণের আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রচলন করতে সাহায্য করছে। তবে "মুক্তগাছা" মাছ চাষের একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল এদের বীজের অভাব। অন্যান্য মাছের তুলনায় এই মাছ একসাথে কম বাচ্চা দেয়। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম ভাবে "মুক্তগাছা" মাছের বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করছেন। আশার কথা হল, "মুক্তগাছা" মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া অন্যান্য অনেক মাছের তুলনায় সহজ। তাই আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই মাছের বীজের সংকট দূর হবে এবং চাষিরা আরও বেশি লাভবান হতে পারবেন।

১.৬. নোনা টেংরা, *Mystus gulio* (হ্যামিল্টন, ১৮৮২)

"নোনা টেংরা" - এই ছোট্ট মাছটি হয়তো দেখতে সাদামাটা, কিন্তু খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিতে ভরপুর। বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন এলাকায় এই মাছ খুবই লোভনীয় একটি খাবার। "নোনা টেংরা" মাছ চাষ করে ভালো আয় করা সম্ভব কারণ এদের চাহিদা বেশ ভালো এবং স্থানীয় বাজারে এটি ২০০-৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এরা খুব সহজেই মরে না এবং খুব দ্রুত বড় হয় বলে

চাষিরা এই মাছ চাষ করতে খুবই আগ্রহী। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই মাছ মিষ্টি ও নোনা - উভয় জলেই চাষ করা যায়!

"নোনা টেংরা" মাছ ধান ক্ষেতে, ভেরিগুলিতে এমনকি ছোট খাঁচায় চাষ করা যায়। এই মাছটি খাঁচায় এবং রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেমে (RAS) উচ্চ ঘনত্বেও চাষ করা যেতে পারে। তবে এই মাছ চাষের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হল এর বীজের অভাব। এই সমস্যা দূর করার জন্য ICAR-CIBA এর কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র বিজ্ঞানীরা একটি সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে "নোনা টেংরা" মাছের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন এবং চাষিদের কাছে তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

রাজ্য- অ্যানিমালিয়া, পর্ব-কর্ডাটা, শ্রেণী অ্যাক্টিম্পটেরিগি, বর্গ-সিলুরিফর্মিস, গোত্র-বাগরিডি, গণ-মিস্টাস্, প্রজাতি- গুলিও।

প্রজনন মৌসুম আসলেই, পূর্ণবয়স্ক নোনা ট্যাংরা মাছকে তাদের পুকুরের জগৎ থেকে ধরে আনা হয়। এরপর, মা মাছের ডিম ছাড়ার জন্য প্রস্তুত কিনা তা বুঝতে ডিম্বাশয়ের একটি ছোট্ট বায়োপসি করা হয়। তবে শুধু ডিম্বাশয় পরীক্ষা নয়, মাছের ডিম্বাণু নির্গমন ছিদ্র দেখেই বোঝা যায় সে প্রস্তুত কিনা। যদি ছিদ্রটি ফুলে যায় এবং লালচে রঙ ধারণ করে, তাহলে বুঝতে হবে ডিম ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে, তাদের যৌন পরিপক্কতা বোঝা যায় গোলাপী রঙের ডগা সম্বলিত লম্বা প্যাপিলার মাধ্যমে।

সাধারণত ৬০ থেকে ১২০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী মাছ এবং ২৫ থেকে ৭৫ গ্রাম ওজনের পুরুষ মাছ প্রজননের জন্য উপযুক্ত। প্রজননের জন্য দুটি পুরুষ মাছের বিপরীতে একটি স্ত্রী মাছের প্রয়োজন হয়। মাছের শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন অথবা লিউটিনাইজিং রিলিজিং হরমোন প্রবেশ করিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়।

নোনা জলে ভেটকি মাছ চাষ: বর্তমান সম্ভাবনা

বাজারে ভেটকি মাছের চাহিদা বেশ চড়া (প্রতি কেজি ৪০০-৬০০ টাকা)। হ্যাচারিতে এর বীজ উৎপাদন করা সম্ভব এবং তৈরি খাবারও পাওয়া যায়। তাই নোনা জলে মাছ চাষে বৈচিত্র্য আনতে

ভেটকি একটি আকর্ষণীয় মাছ। বিশ্বজুড়ে ভেটকি মাছকে খাঁচায়, পুকুরে, এমনকি ট্যাঙ্কেও চাষ করা যায়। তার মানে, ভেটকি মাছ বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ভারতে, ভেটকি মাছ প্রধানত লোনা জলে চাষ করা হয়। মাত্র ৬-৮ মাসের মধ্যে এরা ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত ওজনে বড় হয়। এই চাষ পদ্ধতিতে মাঝেমধ্যে কিছু বড় মাছ ধরে বিক্রি করা হয়। প্রতি হেক্টর জায়গায় ৪০০০-৫০০০ টি ভেটকি মাছের পোনা (প্রতিটির ওজন ৬০-৮০ গ্রাম) দিয়ে চাষ শুরু করলে, ৩.৫ থেকে ৪.০ টন পর্যন্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ প্রায় ১৭৫-২২৫ টাকা প্রতি কেজি এবং বিক্রয় মূল্য ৩৫০-৪০০ টাকা প্রতি কেজি। ভেটকি মাছ চাষের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরির জন্য, 'সিবা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান 'সিবাস প্লাস' নামে একটি বিশেষ ধরণের খাবার তৈরি করেছে। এই খাবার ভেটকি মাছের পোনা এবং বড় মাছ উভয়ের জন্যই উপযুক্ত। এই খাবার ব্যবহার করলে খাবার খরচ (এফসিআর) প্রায় ১:১.৫ হয়।

চিংড়ি চাষের বিকল্প? ভেটকি তো আছেই!

যারা চিংড়ি চাষের বাইরেও ভাবতে চান, তাদের জন্য ভেটকি মাছ চাষ দারুন সম্ভাবনাময়। আর শুধু ভেটকি কেন, কম খরচে চাষ করা যায় এমন আরও অনেক মাছ আছে। যেমন- মিল্কফিশ, আইড়, মুক্তা। এই মাছগুলি পরিবেশবান্ধব। কারণ এরা পুকুরের প্রাকৃতিক খাবারের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে। তাই খরচ কম। তবে পুকুরের সাথে কিছু বাড়তি খাবারও দেওয়া যেতে পারে। CIBA তাদের মুতুকাদু এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনে (MES) মিল্কফিশের কৃত্রিম প্রজননে সাফল্য পেয়েছে। এখন হ্যাচারিতে উৎপাদিত মিল্কফিশের পোনা সারা দেশের চাষিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই পোনা মিল্কফিশের জন্য বিশেষভাবে তৈরি খাবার খেয়ে দ্রুত বড় হয়।মুক্তা মাছের ক্ষেত্রেও CIBA একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এই পদ্ধতিতে মুক্তা মাছের পোনা উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। ছোট চাষিরাও এখন সহজেই মুক্তা মাছের চাষ করতে পারবেন। "খাদ্য, কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধির জন্য নোনা জলে মাছের চাষ" - এই স্লোগানকে সামনে রেখে CIBA কাজ করে যাচ্ছে। তারা বিশ্বাস করে, নোনা জলে মাছ চাষ আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। তাই CIBA বিভিন্ন ধরণের চাষ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছে, যাতে সকল শ্রেণীর চাষিরা উপকৃত হতে পারে।

১) ছোট জায়গায় ভেটকির নার্সারি: CIBA-এর অভিনব উদ্যোগ

ভেটকি মাছের উৎপাদন বাড়াতে CIBA একটি চমৎকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এই পদ্ধতিতে ছোট্ট জায়গাতেই হাপার ভেতর ভেটকির পোনা (ফ্রাই) বড় করা যায়। হ্যাচারিতে জন্মানো পোনাগুলোকে ৬০-৭০ দিন এই হাপায় রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যেই পোনাগুলো আঙ্গুলের মতো বড় হয়ে যায়। এই পদ্ধতি ছোট চাষিদের জন্য অনেক লাভজনক। কারণ এতে খরচ কম এবং কম

সময়ের মধ্যেই লাভ পাওয়া যায়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে পোনা বড় করার জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। তাই যাদের জমি কম, তারাও সহজেই ভেটকি মাছ চাষ করতে পারবেন। এই পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হল, এতে চাষিদের কষ্ট অনেক কম হয়। কারণ হাপার ভেতর থেকে সহজেই পোনা ধরা যায়। তাই চাষিদের পানিতে নেমে পোনা ধরার প্রয়োজন হয় না।

২) ছোট খাঁচায় মাছ চাষ: ছোট চাষির বড় সুযোগ

অনেক ছোট চাষির বড় পুকুর থাকে না। আবার অনেকেই অনেক টাকা খরচ করে মাছ চাষ করতে পারেন না। তাদের কথা চিন্তা করেই CIBA একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এই পদ্ধতিতে ছোট্ট খাঁচায় নোনা জলে মাছ চাষ করা যায়। এতে খরচ অনেক কম হয় এবং বেশি লাভ পাওয়া যায়।

এই খাঁচাগুলো চাষিরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন। প্রতি ঘনমিটার জায়গায় ২৫ টি পোনা দিয়ে শুরু করলে ২০ কেজি পর্যন্ত মাছ পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ ঘনমিটারের একটি খাঁচা থেকে প্রায় ৪৫০-৫০০ কেজি মাছ পাওয়া সম্ভব। বাজারে প্রতি কেজি মাছ যদি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করা যায়, তাহলে একটি খাঁচা থেকে প্রতি মাসে ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা আয় হতে পারে।

এই ছোট খাঁচা তৈরি এবং পুকুরে বসানোর মাধ্যমে ছোট চাষিরা নতুন নতুন কৌশল শিখতে পারবেন এবং আরও বেশি মাছ উৎপাদন করতে পারবেন।

৩) ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি- ট্রফিক অ্যাকুয়াকালচার (IMTA)

পরিবেশ বান্ধব এবং লাভজনক মাছ চাষের জন্য CIBA একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে এসেছে। এই পদ্ধতির নাম IMTA বা ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-ট্রফিক অ্যাকুয়াকালচার। এই পদ্ধতিতে একই পুকুরের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের মাছ চাষ করা হয়। যেমন- তলদেশে চিংড়ি, মাঝখানে রুই জাতীয় মাছ এবং উপরে পানিতে পাবদা জাতীয় মাছ। এই পদ্ধতি অনেক লাভজনক কারণ এতে একই পুকুর থেকে বেশি মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে পরিবেশ দূষণ অনেক কম হয়। CIBA এই পদ্ধতি কাকদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু চাষির কাছে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে এবং তারা বেশ সফল হয়েছে।

৪) ডিম থেকে পোনা: স্বাবলম্বী হওয়ার পথে

মাছ চাষের জন্য সবসময় পোনা কিনতে হয়। কিন্তু CIBA চাষিদের স্বাবলম্বী করার জন্য ডিম থেকে পোনা উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই জন্য তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক চাষি ভেটকি এবং মিল্কফিশ মাছের ডিম থেকে পোনা উৎপাদনে সফল হয়েছেন।

৫) শোভাময় মাছ: সৌন্দর্যের সাথে আয়

শুধু খাওয়ার মাছ কেন, ঘরে বসেই চাষ করা যায় সুন্দর সুন্দর শোভাময় মাছ। যেমন- সিলভার মনি, পায়রা তালি, কমলা ক্রোমাইড, মুক্তা। এই মাছগুলি ঘরে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার জন্য মানুষ খুব পছন্দ করে। CIBA এই মাছগুলির পোনা উৎপাদন এবং চাষ পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে। যাতে মানুষ ঘরে বসেই এই মাছ চাষ করে আয় করতে পারে। ইতিমধ্যে CIBA-এর "মেরা গাঁও মেরা গৌরব" প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক মহিলা মুক্তা মাছের চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন।

ICAR-CIBA নোনা জলে মাছ চাষের উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ধরণের মাছের পোনা উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। এবং এই প্রযুক্তি চাষিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তারা চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা করছে। মাছ চাষের জন্য শুধু পোনা হলেই হয় না, প্রয়োজন হয় পুষ্টিকর খাবারের। CIBA বিভিন্ন ধরণের মাছের জন্য বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরি করছে। যাতে মাছ দ্রুত বড় হয় এবং চাষিরা বেশি লাভবান হতে পারে। CIBA বিশ্বাস করে, মাছ চাষ আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। তাই তারা বিভিন্ন ধরণের চাষ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছে, যাতে সকল শ্রেণীর চাষিরা উপকৃত হতে পারে। তারা চাষিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করছে এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করছে।

৬) বাড়িতে শোভাবর্ধনকারী মাছের বীজ প্রতিপালন:

CIBA, পরিবার পিছু নিয়মিত মাসিক আয় নিশ্চিত করার জন্য সিলভার মুনি, পায়রা তালি, কমলা ক্রোমাইড, মুক্তগাছার মতো শোভাময় মাছের বাড়িতেই নার্সারী পালনকে গ্রহণ করার কথা ভাবছে। CIBA- এর মেরা গাঁও মেরা গৌরব কর্মসূচির অংশ হিসেবে, জীবিকার ক্রিয়াকলাপে মুক্তগাছার নার্সারী পালনকে উপজাতীয় নারী গোষ্ঠী সফলভাবে গ্রহণ করছে।

নোনা জলের মাছ চাষে CIBA-এর অগ্রযাত্রা: উন্নয়নের নতুন দিগন্ত

নোনা জলের মাছ চাষে kranti আনতে ICAR-CIBA কাজ করে যাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য হলো মাছ চাষকে আরও লাভজনক, সহজলভ্য করে তোলা। CIBA নোনা জলের বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য কার্যকর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বিকাশে কাজ করছে। এই প্রযুক্তি বিভিন্ন রাজ্যের উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে তারা পিপিপি মডেলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বেসরকারি খাতে হ্যাচারি স্থাপনের মাধ্যমে মাছের বীজের চাহিদা পূরণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার। CIBA ভেটকিসহ অন্যান্য প্রজাতির জন্য দক্ষ, পরিবেশবান্ধব এবং কম খরচে খাবার তৈরি করেছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ফিড মিলের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নতুন নতুন খাবার তৈরিতে সহায়তা করছে।

CIBA বিশ্বাস করে পারিবারিক মাছ চাষ দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তারা বিভিন্ন রাজ্যে পারিবারিক মাছ চাষ মডেল প্রচলন করছে। এছাড়াও তারা চাষিদের জন্য উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়তা করছে যাতে তারা তাদের উৎপাদিত মাছের সঠিক মূল্য পেতে পারে।

নোনা জলের মাছ চাষ: সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন

ভারতে নোনা জলের মাছ চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

- পরিবেশগত মানচিত্র তৈরি: প্রথমে আমাদের একটি পরিবেশগত মানচিত্র তৈরি করতে হবে যেখানে লবণাক্ত জলের উৎস, মাটির ধরণ, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকবে। এই মানচিত্র মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
- ছোট চাষিদের জন্য সহজ প্রযুক্তি: ছোট এবং প্রান্তিক চাষিরা যাতে সহজেই মাছ চাষ করতে পারে সেজন্য কম খরচে এবং ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বিকাশ করতে হবে।
- জাতীয় জলজ কৃষি নেটওয়ার্ক: মাছের পোনা, খাবার, প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সকল প্রকার সহায়তা একই ছাদের নীচে পেতে একটি জাতীয় জলজ কৃষি নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- স্থায়ী উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা: ICAR-CIBA বিশ্বাস করে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই তারা রাজ্য সরকার, বেসরকারি খাত, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে কাজ করছে।
- বৈচিত্র্যময় মাছ চাষ: শুধুমাত্র এক ধরণের মাছ চাষ না করে বিভিন্ন ধরণের মাছ চাষের মাধ্যমে মাছ চাষ খাতকে আরও লাভজনক করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন স্থান ভেদে উপযুক্ত প্রযুক্তি বিকাশ।

উপসংহারে বলা যায়, নোনা জলের মাছ চাষ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রয়োজন শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা।

ভারতের চিংড়ি চাষের বীমার অর্থনীতি: কৃষক ও বীমাকারীদের ধারণা এবং পণ্যের বিশ্লেষণ

টি. রভিশঙ্কর, আর. গীথা এবং সি. ভি. সাইরাম

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির পরিকাঠামো:

গত দুই বছরে ভারত ৮ লক্ষ টনের বেশি চিংড়ি উৎপাদন করেছে। ভারতে উৎপাদিত চিংড়ির মধ্যে তিনটি প্রধান চিংড়ি হলো ভেনামি চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি এবং গলদা চিংড়ি। ভারতে উৎপাদিত মোট চিংড়ির ৯৬ শতাংশ উৎপাদিত হয় কেবল মাত্র ভেনামি চিংড়ি দ্বারা। প্রত্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় ১.৬ লাখ হেক্টর জমি চিংড়ি চাষের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং ১০ লক্ষের ও বেশি মানুষ এই চাষের সঙ্গে যুক্ত আছে।

বাসমতি চালের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল হলো চিংড়ি। ২০২২-২৩ সালে ভারত থেকে ৭.১১ লক্ষ টন চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানির মাধ্যমে ৪৩,১৩৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। কিন্তু ২০০৯-১০ সালে এই আয় ছিল কেবলমাত্র ৪,১৮২ কোটি টাকা। গত ১৪ বছরে চিংড়ির উৎপাদন ৯ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লাভ বৃদ্ধি চিংড়ি চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নতি এবং চাষের কঠোর নিয়মের জন্য সম্ভব হয়েছে। যদিও রপ্তানির বাজার নির্ভর করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপর, তাই ভারতের চিংড়ি রপ্তানির মূল বাজারগুলি হলো আমেরিকা (৩৯ শতাংশ) চীন, (২০.৫ শতাংশ), ইউরোপ (১৩.৪ শতাংশ) এবং ভিয়েতনাম। চাষীরা ৭০,০০০-১,০০,০০০ টন চিংড়ি দেশীয় বাজারে বিক্রি করে চাষ চলাকালীন এবং রোগের কারণে।

চিংড়ি উৎপাদনে যে ৬ টি দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেগুলি হল ইকুইয়েডর, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড। চিংড়ি উৎপাদনের মূলধন যোগানের কেন্দ্রগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ (মূলত স্পেন এবং ফ্রান্স), চীন এবং জাপান। বর্তমানে বিশ্বের দক্ষিণ ও পূর্বের ধনী দেশগুলির চাহিদা মেটানোর জন্য চিংড়ি চাষ করা হয়। গত কয়েক দশক ধরে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারতও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে, বাহির থেকে SPF (জীবাণুমুক্ত) ভেনামি চিংড়ির ব্রুডস্টক, উন্নত প্রথায় চাষ, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, বেশি ঘনত্বের উৎপাদন এবং ভেনামি চিংড়ির উপযুক্ত বাজারের কারণে ভারতীয় চাষীদের ভেনামি চাষের উপযুক্ত পরিবেশ আছে। এছাড়াও চিংড়ি চাষের সুবিধার জন্য চাষিরা নার্সারি প্রতিপালন, বায়োফ্লক চাষ এবং সারিবদ্ধ ভাবে পুকুরে চাষ করে।

ভারতের রপ্তানি করা চিংড়ির বেশির ভাগই হলো ভেনামি চিংড়ি। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি চিংড়ি উৎপাদন করে (সারণী-১) । ক্ষুদ্র চাষী যারা ২-৩ টি পুকুরের মালিক তারা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করার ফলে তাদের আয় অনেক কম হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগের কারণে যদি চিংড়ি নষ্ট হয়ে যায় তবে চাষীদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং পরবর্তী চাষের জন্য তাদের আবার ঋণ নিতে হয়।

১ নং টোবিল ২০২০-২১ সালে ভারতে মোট চিংড়ি (টাইগার, ভেনামি এবং স্ক্যাম্পি) উৎপাদন

ক্রমিক নম্বর	রাজ্য	ব্যাহৃত এলাকা	উৎপাদন (মেট্রক টন)	উৎপাদন শীলতা টন/হেক্টর
১	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭৪,৫১২	৬,৩৯,৮৯৬	৮,৫৮৮
২	গুজরাট	৯,০২১	৫০,৫২৬	৫,৬০১
৩	তামিলনাড়ু	৮,৬৩০	৪৮,৮১৬	৫,১৯৩
৪	পশ্চিমবঙ্গ	৫০,৮৪৪	৫,৪৫,৪৮২	১,০৭৪
৫	উড়িষ্যা	১১,২০০	৪,৪৪,৫৫৫	৩,৯৭৮
৬	মহারাষ্ট্র	৩,১৪৫	৩,১৮৫	১,০১৩
৭	কর্ণাটক এবং গোয়া	৩,১৪৫	৩,১৮৫	১,০১৩
৮	কেরালা	২,৯৭১	১,৮৬৮	৬২৯
মোট		**১,৬৬,৭২২**	**৮,৪৩,৬৩৩**	**৫,০৬০**

চিংড়ি মূল্য শৃঙ্খল (Value chain) জুরে বীমা অপারেশন

চিংড়ি চাষের বীমা ও সরকারী সহযোগিতার চিত্র টেবিল-২ এ দেখানো হয়েছে। চিংড়ি চাষকে একটি 'ঝুঁকিপূর্ণ' উদ্যোগ হিসাবে বলা হয়েছে। তাই এই চাষের ক্ষেত্রে ঋণ দিতে বা বীমা করতে সতর্ক থাকে বীমা বা প্রতিষ্ঠানগুলি। অন্যান্য ফসল চাষের জন্য ঋন বা বীমার সুবিধা আমাদের দেশে আছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এই কাজের সাথে যুক্ত আছে। কেবলমাত্র চিংড়ি চাষীদের ক্ষেত্রে ফসলের বীমা করতে সরকারি সাহায্যের অভাব রয়েছে।

বর্তমানে NFDB চিংড়ি চাষীদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বীমা প্রিমিয়ামে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু এই প্রকল্পটি সমস্ত চাষীদের কাছে পৌঁছায়নি। যদিও কয়েকটি বীমা কোম্পানি তাদের উৎপাদিত ফসলের ভিত্তিতে বীমা প্রকল্প চালু করেছে, তথাপি প্রকৃত চাষের খরচের কাছে এটা খুবই নগণ্য। ক্ষুদ্র চাষীদের ক্ষেত্রে বীমা করা গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাংকগুলি এই চিংড়ি চাষে অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক।

টেবিল ২: চিংড়ি মূল্য শৃংখল জুড়ে বীমা অপারেশন

	ইনপুট সিস্টেম	কৃষকদের	বাজার	প্রক্রিয়াকরণ	রপ্তানিকারকদের	ভোক্তাদের
আইটেম/অভিনেতা	১. চারা ২. খাবার ৩. অন্যান্য ইনপুট ৪. বুডার ৫. ফিসমিল	১. জমি ২. পুকুর ৩. পরিকাঠামো ৪. শ্রম ৫. ক্রেডিট	১. সমষ্টিকারী ২. পাইকারি বিক্রেতা ৩. কমিশন এজেন্ট ৪. খুচরা বিক্রেতা ৫. বিক্রেতারা	HACCP খাদ্য নিরাপত্তা	১. বাণিজ্য সমস্যা SPS ২. SPS প্রত্যাখ্যান ৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিনিময় হার	১. গুণমান ২. স্বাস্থ্যবিধি ৩. টাকার মূল্য
বীমাযোগ্য	১. হ্যাচারি ২. দেশীয় ফিড মিল ৩. এয়ারেটর/ মোটর/ জেনসেট প্রযোজক	১. চিংড়ি নার্সারি ২. চাষের পুকুর	১. মাছের কোল্ড চেইন ২. মার্কেটিং পরিকাঠামো (ইয়ার্ড, যানবাহন)	১. স্বাস্থ্যবিধি জন্য HACCP ২. অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত পণ্য ৩. এন্টি ডাম্পিং		
সরকার সমর্থন এবং বীমা	১. ফায়ার/ ফ্যাক্টরি ইন্স্যুরেন্স এবং অন্যান্য ন্যাট ক্যাট বীমা ২. মৎস্যজীবী বীমা (রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি সহ)	১. বন্যা/অগ্নি/ মোটর/বান্ড বীমা- খুব কমই নেওয়া হয় ২. কোন ফসল বীমা নেই	১. ব্যবসায়িক বীমা ২. সরকার সমর্থন	১. মালবাহী বীমা ২. ভারত থেকে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি স্কিম MEIS (Badger Rs. 2,000 কোটি)- ১.১.২০২১ থেকে প্রতিস্থাপিত৷ রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক এবং কর মওকুফ (RoDTEP)- এমবেডেড শুল্ক ফেরত		১. মেডিক্লেইম ২. নিয়োগকর্তাদের থেকে স্বাস্থ্য কভার সমর্থন

ছোট পুকুরে মাছ চাষের অসুবিধা

১ নম্বর চিত্রে বীমা ও ঋণের অসুবিধার কারণে ছোট পুকুরে চিংড়ি চাষের অসুবিধাটি চিহ্নিত করা হলো। যেহেতু চাষীদের পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তাই খারাপ চিংড়ির পোষ্ট-লার্ভা ও খাবারের অভাবে তাদের চাষের মান কমে যায় এবং এতে ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছোট মাছ চাষ খামার ধারক

ছোট পুকুরে মাছ চাষের অসুবিধা

বীমার চাহিদার জন্য হটস্পট

অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু ভারতের ভেনামি চিংড়ির ৮৮ শতাংশ উৎপাদন করে। এই রাজ্য গুলির জন্য বীমা বাজারের আকার হিসাবে অনুমান করা হয়।

$$\frac{\text{প্রিমিয়াম হার (গড় ইনপুট খরচ} \times \text{ফসল এলাকা (হেক্টর))}}{১০০}$$

টেবিল ৩ নম্বরে মোট খরচের ১-৪ শতাংশ পর্যন্ত বীমা বাজারের আনুমানিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। মোট চাষের খরচ ১-৪ শতাংশ (২০-৪০ কোটি মার্কিন ডলার) এর জন্য আনুমানিক ১৫০-৬০১ কোটি টাকা।

টেবিল ৩: ভেনামি চিংড়ি শস্য বীমা প্রিমিয়ামের বাজারের আকার

কৃষি এলাকা (হেক্টর)		১০০২০৬
গড় ইনপুট খরচ (টাকা)		১৫০০০০০
মোট টার্ন ওভার (টাকা)		১৫০৩০৯০০০০০০
প্রিমিয়াম হার (% ইনপুট খরচ)	১ শতাংশ	১৫০৩০৯০০০০
	২ শতাংশ	৩০০৬১৮০০০
	৩ শতাংশ	৪৫০৯২৭০০০০
	৪ শতাংশ	৬০১২৩৬০০০০

২০২০-২১ (MPEDA, 2022) সালে চিংড়ি উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে বীমা প্রিমিয়ামের ব্যবসায়ী সম্ভাবনা প্রতিবছর ৭৫০ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। মাইক্রো ক্রেডিট এর প্রয়োজনীয়তা বছরে ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। যেটি উচ্চ সুদের হারে পরিশোধ করতে হয়। এদিকে ব্যাঙ্ক এবং বীমা সংস্থাগুলি লাভজনক ব্যবসায় ক্ষতি, অন্যদিকে ঋণ ও বীমার ন্যূনতম টাকা পরিশোধ কৃষকদের খুব

অসুবিধায় ফেলে। বীমা ও প্রতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণই ফিরিয়ে আনার ফলে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে সাহায্য করবে অনেক কম সময়ের মধ্যে।

	রাজ্য	এলাকা ha (A)	উৎপাদন MT (P	উৎপাদনশীলতা kg/ha (Y)	ভেনামির হেক্টর প্রতি উৎপাদন খরচ @ 230/kg	প্রিমিয়াম মার্কেট সেগমেন্টের মূল্য @ 2% টাকা (কোটি)	প্রিমিয়াম ভ্যালু মার্কেট সেগমেন্টের মূল্য @ 4 টাকা (কোটি)	ইনপুট খরচ Rs. কোটি
ভেনামি চিংড়ি উৎপাদন খরচ Rs. 230/কেজি								
	অন্ধ্র প্রদেশ	৭১৯২১	৬৩৪৬৭২	৮.৮২	২০২৯৬৫১	২৯১.৯৫	৫৮৩.৯০	১০২১৮.২২
	তামিলনাড়ু	৮৬০০	৪৪৭৩৫	৫.২০	১১৯৬৪০১	২০.৫৮	৪১.১৬	৭২০.২৩
	গুজরাট	৮৯৮৬	৫০৪১০	৫.৬১	১২৯০২৬৩	২৩.১৯	৪৬.৩৮	৮১১.৬
	অন্যান্য	৮৬০০	৪৪৭৩৫	৫.২	১১৯৬৪০১	২০.৫৮	৪১.১৬	৭২০.২৩
	মোট	**১০৮৫২৬**	**৮১৫৭৪৫**	**৭.৫২**	**১৭২৮৮১৫**	**৩৭৫.২৪**	**৭৫০.৪৯**	**১৩১৩৩.৪৯**
বাগদা চিংড়ি উৎপাদন খরচ Rs. 250 টাকা/কেজি								
	পশ্চিমবঙ্গ	৫০০০০	১৯১৯০	০.৩৮	৯৫৯৫০	৯.৬	১৯.১৯	৩৩৫.৮৩
	কেরালা	২৮১৩.৮৫	১১২৮.৯৮	০.৪০	১০০৩০৬	০.৫৬	১.১৩	১৯.৭৬
	অন্ধ্র প্রদেশ	২৫৯১	৫২২২	২.০২	৫০৩৮৬০	২.৬১	৫.২২	৯১.৩৯
	কর্ণাটক	২১৭৫	১০০০	০.৪৬	১১৪৯৪৩	০.৫	১.০০	১৭.৫
	অন্যান্য	৬১৬.১৫	১০৭৫.০২	১.৭৪	৪৩৬১৮৪	০.৫৪	১.০৮	১৮.৮১
	মোট	**৫৮১৯৬**	**২৭৬১৬**	**০.৪৭**	**১১৮৬৩৪**	**১৩.৮১**	**২৭.৬২**	**৪৮৩.২৮**

বীমাকৃত পলিসি হোল্ডার হিসাবে মাছ চাষের সমস্যা

ভারতে মাছ চাষের জন্য বীমা প্রকল্প গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে চাষী ও বীমা কোম্পানির উভয়ের জন্য নিচে কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে চাষীরা মনে করেন যে সরকারের বিনামূল্যে বীমা কভার দেওয়া উচিত কারণ তারা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় আয়ে অবদান রাখে, চাষীদের দাবি করা কথাগুলি হলো-

- বীমা কোম্পানির প্রিমিয়ামের হার (৬-১০ শতাংশ) অনেক বেশি।
- ১৯৯০-৯৪ সাল পর্যন্ত বীমা কোম্পানি চিংড়ি নষ্ট হয়ে গেলে বীমা দিত কিন্তু তার পর থেকে তা বন্ধ হয়ে গেছে।
- কঠোর নিয়মাবলী এবং সরকারী কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তার কারণে চাষীদের সমস্যার অনেক কিছুই বাদ দেওয়া আছে।
- জরুরী ভিত্তিক কারণে যখন চিংড়ি তুলে নেওয়া হয় তখন বীমা কোম্পানিকে জানানোর বাস্তবিক আছে।

বীমা কারীদের সাধারণ কিছু চিন্তার বিষয়

বীমা কোম্পানিগুলি এখনো ১৯৯৫-৯৭ সালে চিংড়ি চাষীদের দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেন, যার ফলে চিংড়ি চাষের বীমা বিভাগ থেকে বীমা কোম্পানিগুলি সরে গেছে। তাদের অন্যান্য প্রযুক্তিগত সমস্যা গুলি নিচে দেওয়া হল।

- বীমা কোম্পানিতে মৎস্য চাষীদের অভাব, আধুনিক মাছ চাষের পদ্ধতি এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুশীলনের ফলে সমস্যা।
- মিথ্যা বীমা দাবি (Claim) নিয়ে সমস্যা।
- মহামারী বা নতুন রোগের ফলে বিশাল ক্ষতির ভয়।
- সারাদেশের চাষীদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করার জন্য অনেক লোকবলের প্রয়োজন এবং সেটি ব্যয়সাপেক্ষ।

ভারতীয় চিংড়ি চাষের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি/বিপদ এবং কৃষকদের স্বার্থ:

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আই.সি.এ.আর.-সি.আই.বিএ. কয়েকজন চাষীকে বিভিন্ন প্রকল্পে আওতায় এনে চিংড়ি চাষের ঝুঁকি বা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। চাষীদের কাছ থেকে পাওয়া চিংড়ি চাষের সমস্যা গুলি নিচে দেওয়া হলো।

ঝুকি এবং স্কোর রেঙ্ক ১-১০

১) উপাদান ঝুকি

- ভাইরাস রোগে (৯) সম্পূর্ণ ক্ষতি।
- পরজীবী সংক্রমণ যেমন EHP বা Running mortality syndrome (RMS) এর ফলে (৯) চাষের আংশিক ক্ষতি।
- মূল্য বা দাম (৮)
- বীমা (৬)

২) অনিশ্চয়তা

- প্রতিকূল আবহাওয়া (৭)
- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৭)

- ভূ রাজনৈতিক অবস্থা (৫)
- মহামারী (৪)

চিংড়ি চাষের খরচ ও আয়

চিংড়ি চাষের খরচ চাষের প্রথম দিন থেকে উত্তোরাত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ভেনামি চিংড়ি গড়পড়তা ন্যূনতম ৬০ দিন চাষের পরেই বিক্রয় যোগ্য হয়। ৬০ দিনের মধ্যে যদি ভাইরাস রোগে চিংড়ির ক্ষতি হয় তবে চাষিরা কিছু আয় করতে পারবে না। কিন্তু ৬০ দিনের পর চিংড়ির ক্ষতি হলে চাষের মোট খরচের কিছু সামান্য পরিমাণ ফিরে পায়।

চিংড়ি ফসল বীমা সম্পর্কে চাষীদের দৃষ্টিভঙ্গি (চিত্র-২)

- কম সময়ের জন্য কভারেজ (৪০-৭৫ দিন সর্বোচ্চ)
- সম্পূর্ণ কভার
- সম্পূর্ণ বীমা দাবি (claim)
- সরকারের থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি

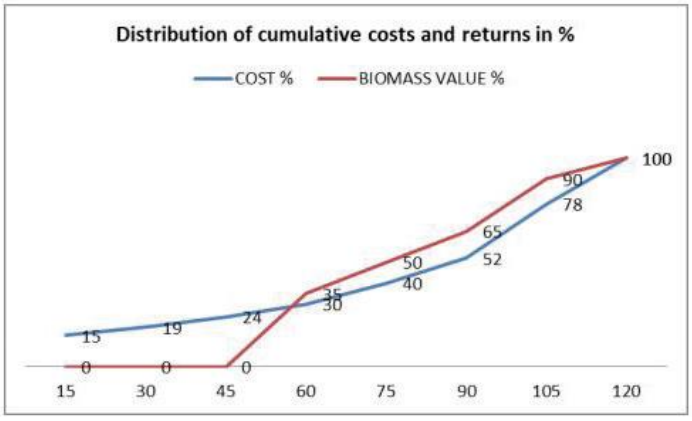

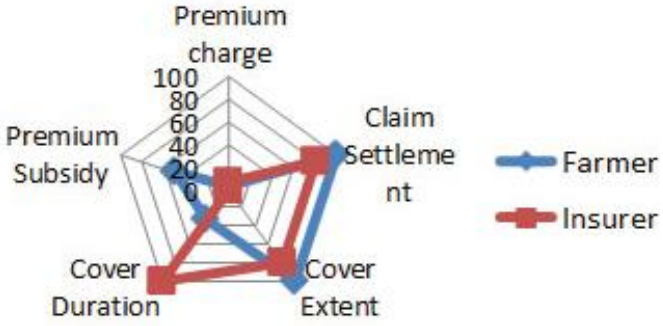

চিংড়ির ফসল বীমা নিয়ে চাষী ও বীমা কারীদের মধ্যে বিরোধিতার কারণ

- কভার সময়কাল ৪৫-৬০ দিন বনাম সম্পূর্ন চাষের সময় দিনকাল
- প্রিমিয়ামে হার (২ শতাংশের বেশি)
- ক্ষতিপূরণ - মোট চাষের খরচের ৮০ শতাংশ বনাম ১০০ শতাংশ

চিংড়ি চাষের পুকুর প্রস্তুতি, এরেটার, জেনারেটর ও অন্যান্য জিনিসের জন্য বীমার মূলধন গঠন ১৫,০০০ লক্ষ কোটি টাকার ও বেশি। চিংড়ি চাষের জন্য বছরে ১০,০০০-২৫,০০০ কোটি টাকা লোনের প্রয়োজন। মাছ চাষের ক্ষেত্রে আয় অনেক বেশি হারে (৬৫ শতাংশ বেশি) অন্যান্য খাতের ঋনের তুলনায় চিংড়ি ঋনের পুনরুদ্ধার করা তুলনামূলক ভাবে সহজ। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে হেক্টর প্রতি ৩-৫ পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া যেতে পারে।

চিংড়ি চাষের বীমা পণ্যের বিশ্লেষণ

একটি শক্তিশালী ও ভালো প্রকল্পের জন্য বীমাকারী ও বীমাকৃত উভয়পক্ষের ভয় এবং অসুবিধা গুলি কম করার প্রয়োজন। বীমাকারিদের অফার এবং কৃষকদের চাহিদার একটি পণ্যের ব্যবধানের বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হয়েছে।

প্যারামিটার	বর্তমান রাজ্য- বীমা কোম্পানির অফার	কাঙ্খিত রাজ্য- চিংড়ি চাষীদের প্রয়োজনীয়তা	ফাঁক	প্রতিকার প্রস্তাবিত
বিমাকৃত অর্থের উপর প্রিমিয়াম (ইনপুট খরচ)	২.৭ - ৪%	১ - ২%	১.৭ - ২%	বীমা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে; সরকারী সহায়তা, যদি ৫০% প্রিমিয়ামের জন্য বাস্তবায়িত হয়, তাহলে শূন্যস্থান পূরণ করবে
কভারেজ	ইনপুট খরচের ৮০%	ইনপুট খরচের ১০০%	২০%	প্রিমিয়ামে সরকারী সহায়তা এই ব্যবধান পূরণ করতে পারে
বীমার ধরন	প্যারামেট্রিক- আবহাওয়া ভিত্তিক	রোগ কভার সহ ব্যাপক	রোগের ক্ষতি না হলে কৃষকরা আগ্রহী হবে না	বীমা কোম্পানিগুলিকে জলজ চাষ বীমার জন্য যোগ্য সার্ভেয়ারদের নিযুক্ত করতে হবে
ক্ষতির ধরন	মোট ক্ষতি	আংশিক ক্ষতিও কভার করতে হবে	২০-৮০%	বীমা কোম্পানীর পূর্ণাঙ্গ অ্যাকোয়া ফিল্ড স্টাফ না থাকলে, কিছু অপরাধী/অবহেলা দাবি মামলার কারণে আংশিক ক্ষতি পূরণ করা যাবে না।
সময়কাল	পূর্ণ ফসল	৪৫-৬০ দিন	৪০-৬০ দিন	বীমা কোম্পানিগুলিকে কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা উচিত

কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার পর জানা গেছে যে কৃষকরা চিংড়ি চাষের বীমা নিতে ইচ্ছুক, তবে চাষীরা সরকারের কাছ থেকে এই বীমার কিছুটা ভর্তুকিও আশা করে। চাষীদের অন্যান্য প্রত্যাশা হল সম্পূর্ণ কভারেজ, ২ মাসের মধ্যে রোগ লেগে চিংড়ি নষ্ট হয়ে গেল তার জন্য বীমা এবং এখানে

চাষীদের প্রত্যাশা সরকার যেন চাষীদের চাষের শুরুতে যেন সাহায্য করে। সরকারি সংস্থাগুলিকে বীমাকারী ও চাষীদের জন্য সারাদেশ জুড়ে সচেতনভাবে অভিযান করতে হবে, যাতে এই ফাঁক গুলি পূরণ করা যায়। সরকার এই নিম্নলিখিত উপায় গুলির মাধ্যমে মাছ চাষে বীমাকে সহায়তা করতে পারে।

- রাজ্যের মৎস্য বিভাগগুলিকে কেন্দ্রীয় খাতের স্কীমের সঙ্গে যুক্ত করে কৃষকদের বীমা দেওয়া
- সরকারি লাভ হিসাবে কৃষকদের বীমার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভর্তুকি প্রদান করা
- একটি যুক্তিসঙ্গত এবং ভর্তুকি মূল্যে বীমা সংস্থাগুলিকে পুনরায় বীমা প্রদান করা
- বিশ্বের কিছু উন্নত দেশ একটি বীমা স্থিতিশীলতা তহবিলের সাথে বীমা প্রকল্পে টিকিয়ে রাখা নিশ্চিত করেছে।

প্রথমটি অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়নি, কারণ রাজ্য সরকারের মৎস্য বিভাগের ভিতরের সমস্যার জন্য। দ্বিতীয় প্রকল্পটি NFDB দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি চাষীদের ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারী হতে পারে। স্বল্প সময়ে ব্যবসায়িক মুনাফা বাড়ানোর জন্য লাভজনক হতে পারে। যখন বড় আকারের ক্ষতি হয়, তখন মোট বীমা দাবির আকার বড় হয় এবং তখন এই বীমাকারী বিরক্ত বোধ করেন। যদিও এই ছোট ছোট বীমা কোম্পানিগুলি বিশ্বের বড় বড় বীমা কোম্পানির কাছ থেকে পুন: বীমা পায় কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে। ভারত সরকার ১০০ কোটি টাকার একটি "বীমা স্থিতিশীল তহবিল" প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা বীমাকারীর প্রতিনিধি এবং বীমাকৃত সরকারি মনোনীত প্রতিনিধীরা চালিত করবে। যদিও সরকারি ভাবে ১.৫ লক্ষ্য হেক্টর জমি ভেনামি চাষের জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে, কিন্তু মনে করা হয় এই চাষের জমি তার দ্বিগুণ পরিমাণ আছে যদি মিষ্টি জলে ভেনামি চাষকেও এর মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু ভেনামির এত খামারের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক খামারেরই CAA এর লাইসেন্স আছে। তাই কিছু ইচ্ছুক বীমা কোম্পানির আওতায় থাকা পুকুরগুলিতে একটি পাইলট স্কেলে একটি বীমা কভারেজ স্কিম চালানো যেতে পারে। বীমা কোম্পানিগুলিকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে কোন বীমা কারীদের সাথে পুন:বীমাকারীদের সাথে পু:নবীমা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

যখন একজন চাষী ভালো চিংড়ি উৎপাদন করে, তখন বীমা কোম্পানির কাছে চাষীর কয়েকটি দাবি থাকে। তখন বীমা কোম্পানি বীমার টাকা থেকে তার কোম্পানির খরচ বাদ দিয়ে বাকি উদ্ভূত টাকা "বীমা স্থিতিশীলতা তহবিলে" পাঠিয়ে দেবে। যখন চাষীদের রোগ বা অন্য কোন কারণে বড় ধরনের ক্ষতি হয় তখন "বীমা স্থিতিশীলতা তহবিল" এর সম্মতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবে। বীমা কোম্পানিগুলি তাদের পছন্দ অনুযায়ী বীমা কারীদের সাথে পুন:বীমা কারার স্বাধীনতা পাবে। যা

তাদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এই প্রকল্পের বাইরে থাকবে। যেহেতু চাষীদের মূলত চাষের ৬০ দিনের বীমার প্রয়োজন, তাই এই প্রকল্পটি এক বার চাষের জন্য চালু হতে পারে। চাষের ৬০ দিন পর চাষীরা চিংড়ি বিক্রি করে তাদের খরচ তুলতে পারে।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে ঋণ

মাছ চাষ ব্যাঙ্কগুলিকে জন্য বিশাল ব্যবসার সুযোগ প্রদান করে। ভারতে চিংড়ি চাষের জন্য হেক্টর প্রতি ৭.৫-১০ লক্ষ টাকার বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়। এই চাষের জন্য পুকুর, এরেটার, জেনারেটার অন্যান্য জিনিসের জন্য ১৫ লক্ষ কোটি টাকার মুলধন গঠন হয়। এছাড়াও আধুনিক মাছ চাষের জন্য প্রতিষ্ঠা প্রতিটা চাষের জন্য ১০,০০০-১৫,০০০ কোটি ঋণ করতে হয় এবং এই ঋণ ওই খাতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু চিংড়ির বাজার মূল্য ভালো, তাই অন্য চাষ, শিল্প এবং অন্যান্য খাতের তুলনায় চিংড়ির খাত থেকে ঋণ পুনরুদ্ধার করা সহজ হয় ঋণ প্রতিষ্টান গুলির। ভারত সরকার এই চিংড়ি চাষীদের থেকে কোন কিছুর জমা ছাড় বা অল্প কিছু জমা রেখে লোনের ব্যবস্থা করে সুবিধা দিতে পারেন। প্রযুক্তিগতভাবে চিংড়ি চাষের বাণিজ্যিক কার্যকারিতা থেকে কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ বা বীমা বন্ধ করা যাবে না। ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (NFDB) এর মতে সংস্থা গুলিকে কৃষকদের মাছ চাষের বীমা গুলিকে সহজতর করার চেষ্টা করা উচিত কারণ ইতিমধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট (NABARD) এর উচিত কোন জামানত ছাড়া চিংড়ি চাষীদের ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা। মাছ চাষের ক্ষেত্রে যৌথ দায়বদ্ধতা গোষ্ঠী (Joint liability group) তৈরি করা উচিত। যৌথ সুরক্ষায় কৃষকদের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক গুলিকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা ও করা উচিত। এই প্রচেষ্টা গুলি এই চাষের মেরুদন্ড সেই ক্ষুদ্র ও আকাঙ্ক্ষিত চাষীদের সমস্যা কমাবে।

উপসংহার

জৈবনিরাপত্তা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও, দুরারোগ্য রোগগুলি কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি করে। বীমা কোম্পানিগুলি এই ছোটো চাষীদের ক্ষতি কাটিয়ে উড়তে সাহায্য করে। এই চাষ সাধারণত ১০০-১১০ দিনের জন্য হওয়ায় বীমা সংখ্যা গুলির ঝুঁকি কম থাকে এবং ৬০ দিন পরও চাষিরা চিংড়ি বিক্রি করে চাষের খরচ ও বীমা শোধ করতে পারে। ছোট প্রকল্পগুলি বড় প্রকল্পে রূপান্তরিত করা যেতে পারে বেশি সংখ্যক চাষী ও বেশি সংখ্যক বীমা কোম্পানিকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে "বীমা স্থিতিশীলতা তহবিলের" পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

দক্ষ চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিএআর-সিআইবিএ -এর অভিনব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

এম. কুমারন, ডি. দেবরাল ভিমলা এবং এস. জয়াপভিথ্রান

ভূমিকা

আমাদের দেশের অনেক কৃষক চিংড়ি চাষ করেন। কিন্তু প্রায়ই তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন: রোগবালাই, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, guণে কম দাম ইত্যাদি। ফলে তাদের লাভ কম হয়। এই সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ICAR-CIBA দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে: সিআইবিএ শ্রিম্প অ্যাপ (CIBA ShrimpApp) এবং সিআইবিএ শ্রিম্প কৃষি (CIBA ShrimpKrishi)। এই অ্যাপ দুটি চিংড়ি চাষিদের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য সাথীর মতো কাজ করবে।

কীভাবে এই অ্যাপ দুটি সাহায্য করবে?

- সঠিক তথ্য এবং পরামর্শ: চিংড়ি চাষ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং আধুনিক পদ্ধতি এই অ্যাপ দুটি থেকে জানা যাবে।
- খরচ কমানো: খাবার ও অন্যান্য উপকরণের সঠিক পরিমাণ ব্যবহার করে কিভাবে খরচ কমানো যায় তা শিখতে পারবেন চাষিরা।
- রোগ শনাক্তকরণ এবং প্রতিকার: চিংড়ির বিভিন্ন রোগ শনাক্তকরণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে জানা যাবে এই অ্যাপ দুটি থেকে।
- বাজার মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান: চিংড়ির বাজার দর সম্পর্কে আপডেট তথ্য পাবেন চাষিরা।
- সহজলভ্যতা: CIBA ShrimpApp এবং CIBA ShrimpKrishi অ্যাপ দুটি গুগল প্লে স্টোর থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

এই ধরণের মোবাইল অ্যাপ চিংড়ি চাষ খাতে আনতে পারে। এই অ্যাপ দুটি চিংড়ি চাষিদের আরও দক্ষ এবং লাভবান হতে সাহায্য করবে।

ShrimpApp-এর ফ্রেমওয়ার্ক এবং মডিউলগুলি চিত্র-1- এ দেওয়া হয়েছে এবং নীচে মডিউলগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

CIBA ShrimpApp অ্যাপটি চিংড়ি চাষিদের জন্য একটি ব্যবহারিক ম্যানুয়ালের মতো যা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করবে।

CIBA ShrimpApp-এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ:

১) মডিউল অন বেটার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস (IBMP')

এই বিভাগে চিংড়ি চাষের প্রতিটি ধাপের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। যেমন:

- স্থান নির্বাচন এবং পুকুর তৈরি: কোথায় এবং কীভাবে চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর তৈরি করতে হবে তা জানা যাবে।
- পোনা নির্বাচন এবং মজুত: কোন জাতের পোনা ব্যবহার করবেন এবং কীভাবে পুকুরে ছাড়বেন তা শিখতে পারবেন।
- খাবার পরিচালনা: কী পরিমাণে এবং কখন খাবার দিতে হবে তা জানা যাবে।
- জলের গুণমান পরিচালনা: পুকুরের জলের গুণমান কীভাবে ঠিক রাখতে হবে তা শিখতে পারবেন।
- রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা: চিংড়ির বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানা যাবে এবং কীভাবে প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা করতে হবে তা শিখতে পারবেন।
- খাদ্য নিরাপত্তা এবং রেকর্ড রাখা: কীভাবে নিরাপদ খাবার উৎপাদন করবেন এবং সঠিক ভাবে রেকর্ড রাখবেন তা জানা যাবে।

২) ইনপুট গণনার মডিউল:

এই বিভাগে চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ সহজেই বের করার জন্য আটটি ক্যালকুলেটর রয়েছে। যেমন:

- পুকুরের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়
- পুকুরে জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়
- জীবাণুনাশকের পরিমাণ নির্ণয়
- খাবারের পরিমাণ নির্ণয়
- খনিজ পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়
- মাটির pH মান সমন্বয়
- বায়ু সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ নির্ণয়

৩) খামারে রোগ নির্ণয়ের মডিউল:

CIBA ShrimpApp-এর "রোগ শনাক্তকরণ" বিভাগটি চিংড়ি চাষিদের এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

কীভাবে এটি কাজ করে?

- চিত্র ভিত্তিক রোগ শনাক্তকরণ: এই অ্যাপে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত চিংড়ির ছবি রয়েছে।
- উপসর্গের তুলনা: চাষিরা তাদের চিংড়ির উপসর্গের সাথে অ্যাপে থাকা ছবির তুলনা করতে পারবেন।
- সাধারণ এবং নিশ্চিত উপসর্গ: প্রতিটি রোগের জন্য সাধারণ এবং নিশ্চিত উপসর্গের ছবি দেওয়া আছে।
- সম্ভাব্য রোগ এবং তার প্রতিকার: উপসর্গ মিলে গেলে অ্যাপটি সম্ভাব্য রোগ এবং তার কারণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিকার সম্পর্কে তথ্য দেবে।
- প্রশ্ন করার সুযোগ: যদি উপসর্গ মিলে না যায় তাহলে চাষিরা অ্যাপের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন করতে পারবেন।

৪) চিংড়ি খামারের ঝুঁকি মূল্যায়ন

CIBA ShrimpApp-এর "খামারে রোগ নির্ণয়" বিভাগটি এই ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষিদের জন্য এক অনন্য সহায়ক।

কীভাবে এটি কাজ করে?

- ধাপে ধাপে প্রশ্ন: এই বিভাগে চাষের বিভিন্ন ধাপের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন করা হয়।
- তিনটি পর্যায়: চাষের বয়স অনুযায়ী প্রশ্নগুলো তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত:

পর্যায়-১: চাষের প্রথম ৪০ দিন পর্যন্ত।

পর্যায়-২: চাষের ৪১ থেকে ৮০ দিন পর্যন্ত।

পর্যায়-৩: চাষের ৮১ দিন পর থেকে।

- ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ: ভুল উত্তর দিলে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাষিকে সতর্ক করে দেয় যে তার খামার ঝুঁকিতে রয়েছে।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পরামর্শ: সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর অ্যাপটি খামারের ঝুঁকির স্তর নির্ণয় করে এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

৫) আপডেট এবং পরামর্শ মডিউল:

CIBA ShrimpApp-এর "আপডেট এবং পরামর্শ" বিভাগটি এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কীভাবে এটি কাজ করে?

- সর্বশেষ তথ্য এবং পরামর্শ: এই বিভাগে চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য, পরিবর্তিত নিয়ম-নীতি, বাজার দর ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো হয়।
- বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ: চিংড়ি চাষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এখানে পাওয়া যাবে।
- PDF ফাইল ডাউনলোড: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ PDF ফাইল আকারে ডাউনলোড করে রাখা যাবে।
- নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানানো: নতুন কোন আপডেট এলে চাষিরা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

৬) ভারত সরকাবের রেগুলেশন এবং নির্দেশিকা মডিউল:

চিংড়ি চাষ করতে গেলে সরকারি নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জানা খুব জরুরি। CIBA ShrimpApp-এর এই বিভাগে আপনারা পাবেন:

- চিংড়ি চাষ সম্পর্কিত সকল সরকারি নিয়ম-কানুন এবং নির্দেশিকা।
- উপকূলীয় জলজ চাষ অথরিটি থেকে খামার নিবন্ধন এবং নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম।
- সরকার অনুমোদিত পোনা সরবরাহকারী, হ্যাচারি, খামার এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের তালিকা।

৭) **FAQ মডিউল:**

চিংড়ি চাষ সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে এই বিভাগটি অত্যন্ত সহায়ক।

- প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর এখানে পাওয়া যাবে।
- পুকুর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে চিংড়ি ধরা এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- সহজ ভাষায় লেখা এবং পছন্দ অনুযায়ী ভাষা ও ফন্ট পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে।
- কিওয়ার্ড ব্যবহার করে কোন নির্দিষ্ট বিষয় খুঁজে বের করা যাবে।

৮) **জিজ্ঞাসা মডিউল প্রেরণ জিজ্ঞাসা মডিউল:**

কোন প্রশ্নের উত্তর FAQ তে না পেলে সরাসরি বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন করতে পারবেন।

- লিখে অথবা ছবি দিয়ে আপনার প্রশ্ন জানাতে পারবেন।
- বিশেষজ্ঞরা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

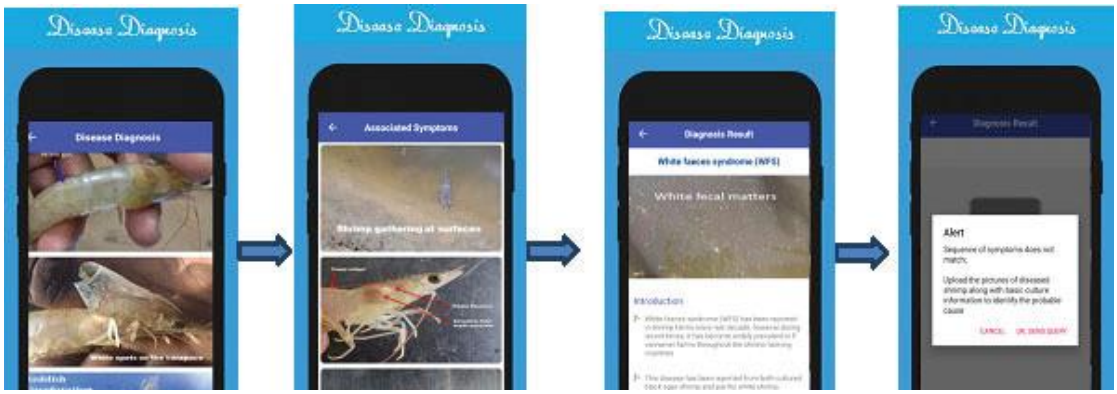

P.vannamei চিংড়ি চাষের উপর মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক রোগ সনাক্তকরন

CIBA ShrimpKrishiApp

CIBA ShrimpKrishiApp একটি কার্যকর ও ব্যবহার সহজ অ্যাপ যা চিংড়ি চাষিদের তাদের খামার ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। এই অ্যাপটি বর্তমানে ইংরেজি, হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় উপলব্ধ।

শুরু করা যাক:

- নিবন্ধন: প্রথমে আপনাকে অ্যাপটিতে নিবন্ধন করতে হবে। এর জন্য আপনার খামার এবং অবকাঠামো সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিতে হবে।

- ড্যাশবোর্ড: নিবন্ধনের পর আপনি অ্যাপের ড্যাশবোর্ডে প্রবেশ করতে পারবেন। এখানে আপনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ বোতাম পাবেন:
  - এককালীন তথ্য প্রদান
  - প্রতিদিনের তথ্য প্রদান
  - পরামর্শ
  - প্রশ্ন করুন

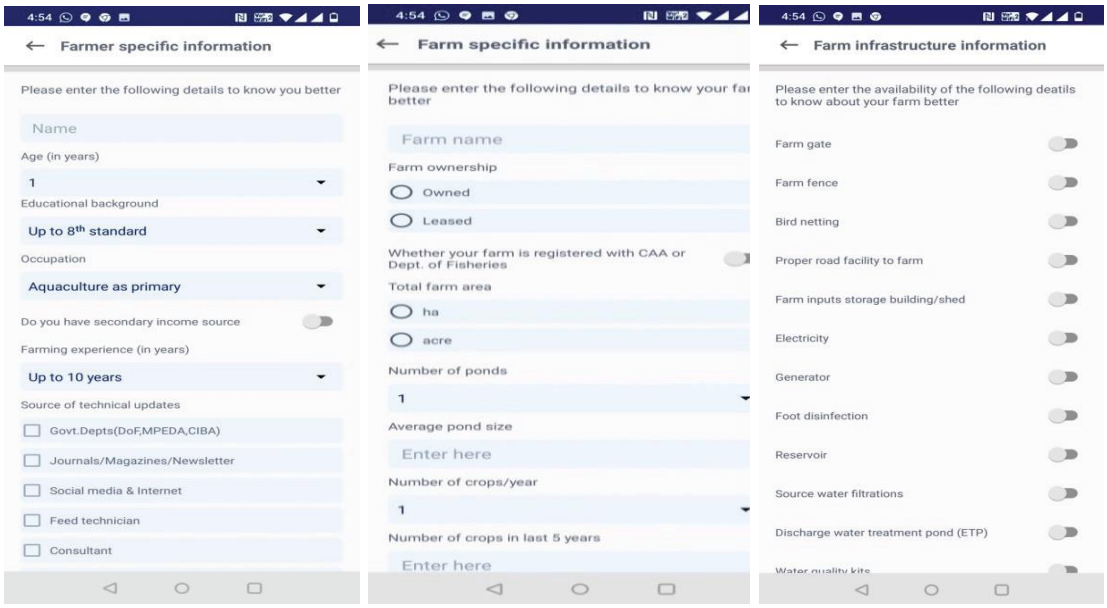

তথ্য প্রদান করুন:

অ্যাপটিতে দুই ধরনের তথ্য প্রদান করতে হয়:

- খামারের তথ্য: এককালীন তথ্য প্রদান এবং এতে আপনার খামার সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য রয়েছে।
- পুকুরের তথ্য: এই তথ্য তিন ধরনের হয়:
  - এককালীন তথ্য: পুকুর প্রস্তুতি, পোনা নির্বাচন এবং মজুত সম্পর্কিত তথ্য।
  - প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য: জলের গুণমান, খাবার প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
  - প্রতিদিনের তথ্য: জলের গুণমান, খাবার পরিমাণ, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং খরচ সম্পর্কিত তথ্য।

CIBA Shrimp Krishi
POND 1
POND 2
POND 3
Total feed used: 1278.755
Survival: 92.05
Biomass: 1033.68
FCR: 1.24
Biomass
One time entry
Daily entry
Recommendations
Post a query

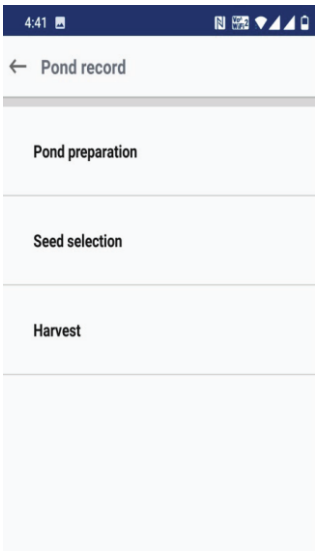
Pond record
Pond preparation
Seed selection
Harvest

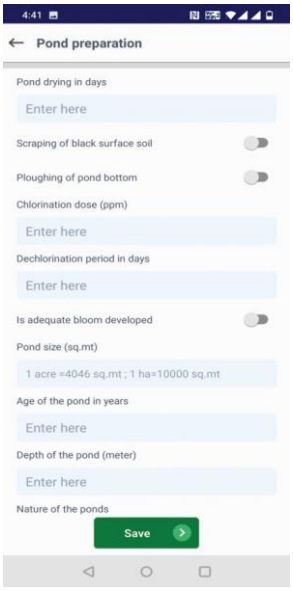
Pond preparation
Pond drying in days
Enter here
Scraping of black surface soil
Ploughing of pond bottom
Chlorination dose (ppm)
Dechlorination period in days
Is adequate bloom developed
Pond size (sq.mt)
1 acre =4046 sq.mt ; 1 ha=10000 sq.mt
Age of the pond in years
Depth of the pond (meter)
Nature of the ponds
Save

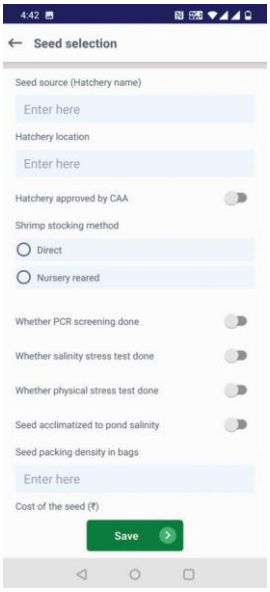
Seed selection
Seed source (Hatchery name)
Enter here
Hatchery location
Hatchery approved by CAA
Shrimp stocking method
Direct
Nursery reared
Whether PCR screening done
Whether salinity stress test done
Whether physical stress test done
Seed acclimatized to pond salinity
Seed packing density in bags
Cost of the seed (₹)
Save

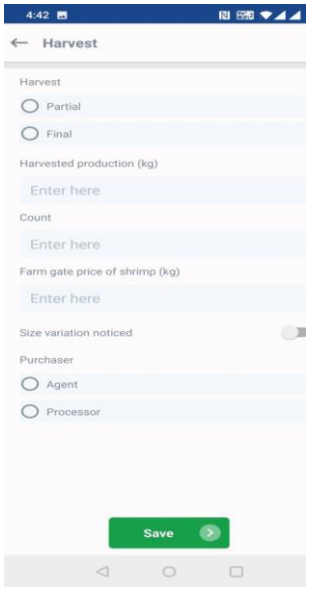
Harvest
Harvest
Partial
Final
Harvested production (kg)
Enter here
Count
Farm gate price of shrimp (kg)
Size variation noticed
Purchaser
Agent
Processor
Save

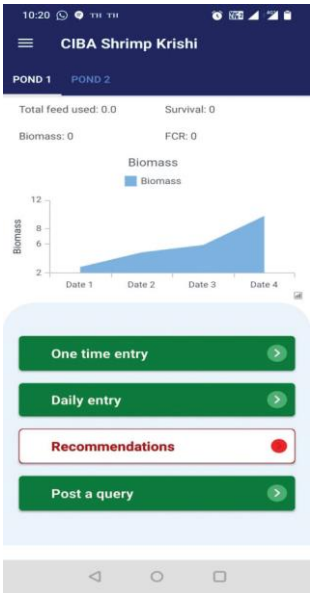
CIBA Shrimp Krishi
POND 1
POND 2
Total feed used: 0.0
Survival: 0
Biomass: 0
FCR: 0
Biomass
One time entry
Daily entry
Recommendations
Post a query

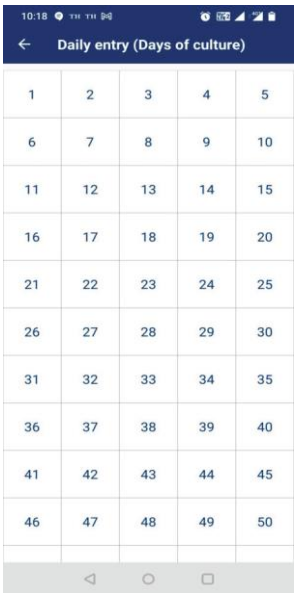
Daily entry (Days of culture)

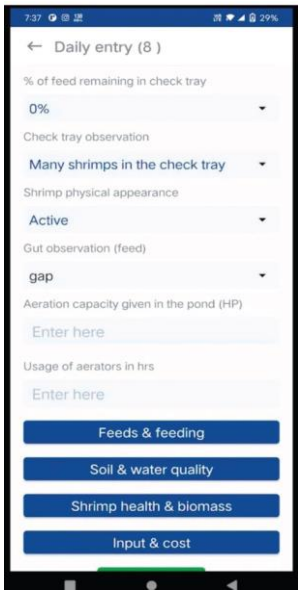
Daily entry (8)
% of feed remaining in check tray
0%
Check tray observation
Many shrimps in the check tray
Shrimp physical appearance
Active
Gut observation (feed)
gap
Aeration capacity given in the pond (HP)
Enter here
Usage of aerators in hrs
Enter here
Feeds & feeding
Soil & water quality
Shrimp health & biomass
Input & cost

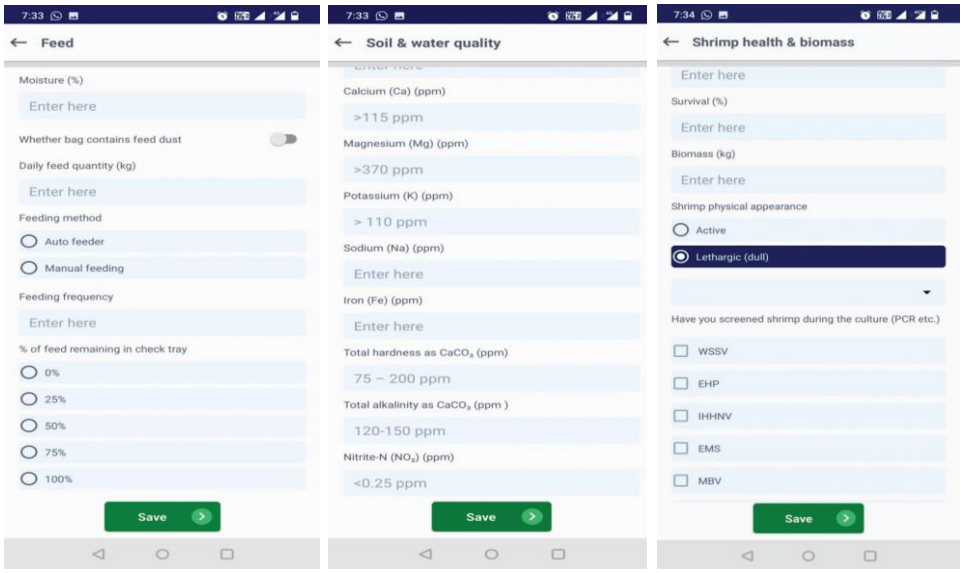
Feed
Moisture (%)
Enter here
Whether bag contains feed dust
Daily feed quantity (kg)
Enter here
Feeding method
Auto feeder
Manual feeding
Feeding frequency
Enter here
% of feed remaining in check tray
0%
25%
50%
75%
100%
Save
Soil & water quality
Calcium (Ca) (ppm)
>115 ppm
Magnesium (Mg) (ppm)
>370 ppm
Potassium (K) (ppm)
> 110 ppm
Sodium (Na) (ppm)
Enter here
Iron (Fe) (ppm)
Enter here
Total hardness as CaCO3 (ppm)
75 – 200 ppm
Total alkalinity as CaCO3 (ppm)
120-150 ppm
Nitrite-N (NO2) (ppm)
<0.25 ppm
Save
Shrimp health & biomass
Enter here
Survival (%)
Enter here
Biomass (kg)
Enter here
Shrimp physical appearance
Active
Lethargic (dull)
Have you screened shrimp during the culture (PCR etc.)
WSSV
EHP
IHHNV
EMS
MBV
Save

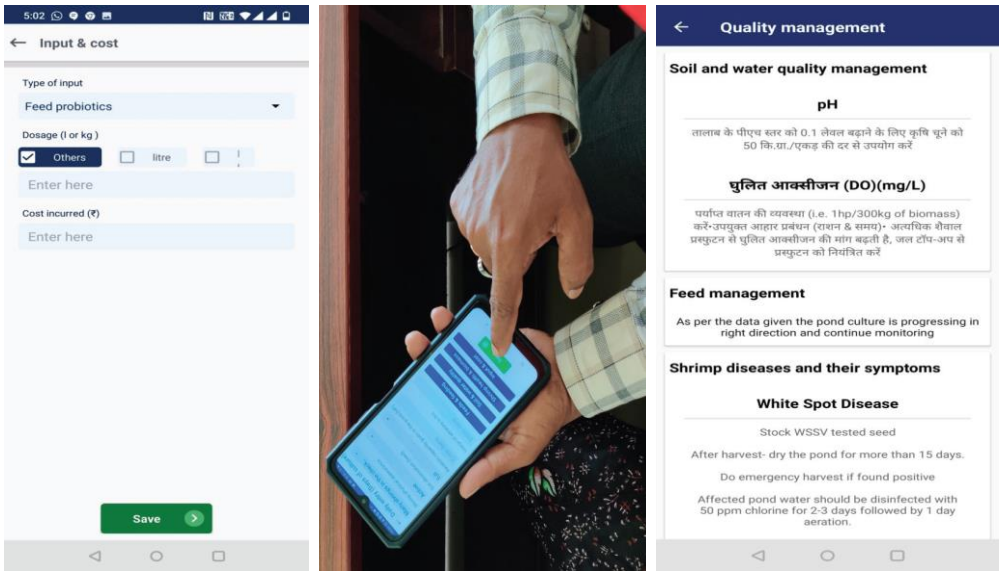
Input & cost
Type of input
Feed probiotics
Dosage (l or kg)
Others
litre
Enter here
Cost incurred (₹)
Enter here
Save
Quality management
Soil and water quality management
pH
तालाब के पीएच स्तर को 0.1 लेवल बढ़ाने के लिए कृषि चूने को 50 कि.ग्रा./एकड़ की दर से उपयोग करें
घुलित आक्सीजन (DO)(mg/L)
पर्याप्त वातन की व्यवस्था (i.e. 1hp/300kg of biomass) करें•उपयुक्त आहार प्रबंधन (राशन & समय)• अत्यधिक शैवाल प्रस्फुटन से घुलित आक्सीजन की मांग बढ़ती है, जल टॉप-अप से प्रस्फुटन को नियंत्रित करें
Feed management
As per the data given the pond culture is progressing in right direction and continue monitoring
Shrimp diseases and their symptoms
White Spot Disease
Stock WSSV tested seed
After harvest- dry the pond for more than 15 days.
Do emergency harvest if found positive
Affected pond water should be disinfected with 50 ppm chlorine for 2-3 days followed by 1 day aeration.

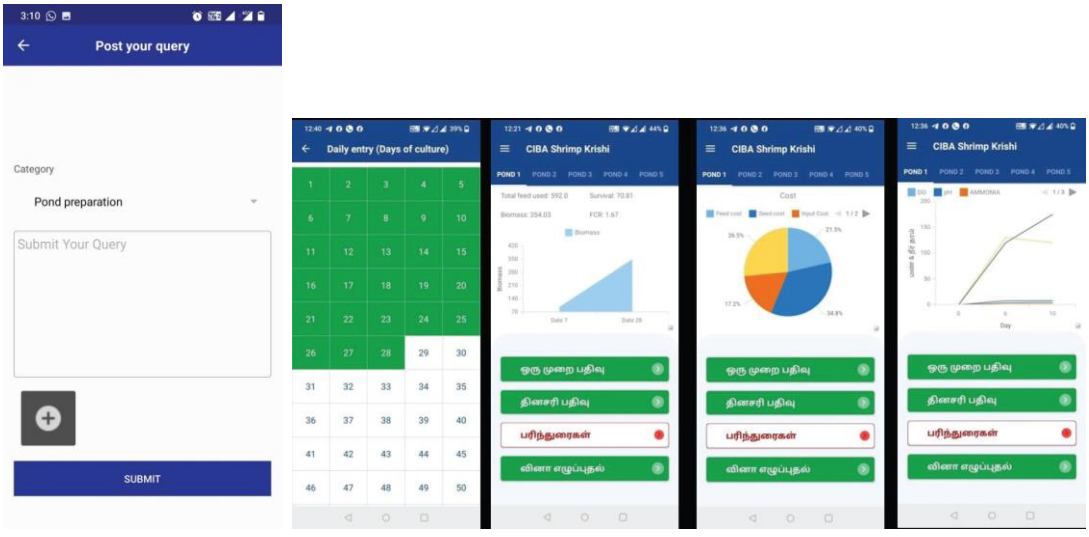
Post your query
Category
Pond preparation
Submit Your Query
SUBMIT
Daily entry (Days of culture)
CIBA Shrimp Krishi
ஒரு முறை பதிவு
தினசரி பதிவு
பரிந்துரைகள்
வினா எழுப்புதல்

CIBA ShrimpKrishiApp চিংড়ি চাষিদের জন্য একটি সম্পূর্ণ সহায়িকা। এই অ্যাপ ব্যবহার করে চাষিরা তাদের খামার ব্যবস্থাপনা করে ভালো ফলন পেতে পারবেন।

CIBA ShrimpKrishiApp: আপনার খামার, আপনার নিয়ন্ত্রণে

CIBA ShrimpKrishiApp শুধু তথ্য সংরক্ষণ করে না, এটি আপনার খামার ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কীভাবে এটি কাজ করে?

- তথ্য সংরক্ষণ: প্রতিটি তথ্য প্রদানের পর "সংরক্ষণ" বোতামে ক্লিক করতে ভুলবেন না। এতে করে আপনার তথ্য নিরাপদে রাখা হবে।
- নিয়মিত তথ্য প্রদান: চাষের প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত তথ্য প্রদান করুন। এতে করে অ্যাপটি আপনার খামারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পেতে পারবে।
- এক নজরে খামার: ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি আপনার প্রতিটি পুকুরের তথ্য এক নজরে দেখতে পাবেন, যেমন:
    - জীবিত পোনার পরিমাণ
    - খাবার গ্রহণের হার
    - পোনার ওজন
    - জলের গুণমান
    - খরচ

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ:

অ্যাপটিতে তিনজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- খাবার ব্যবস্থাপনা
- জলের গুণমান ব্যবস্থাপনা
- রোগ ব্যবস্থাপনা

সতর্কীকরণ:

আপনার প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, যদি কোন ঝুঁকি থাকে, যেমন জলের গুণমান খারাপ হওয়া বা পোনার রোগ, তাহলে অ্যাপটি আপনাকে সতর্ক করে দেবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

তথ্য ব্যবহার:

আপনি আপনার খামারের সমস্ত তথ্য এই অ্যাপে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। এই তথ্য আপনি পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবেন অথবা বিশেষজ্ঞদের সাথে শেয়ার করে পরামর্শ নিতে পারবেন।

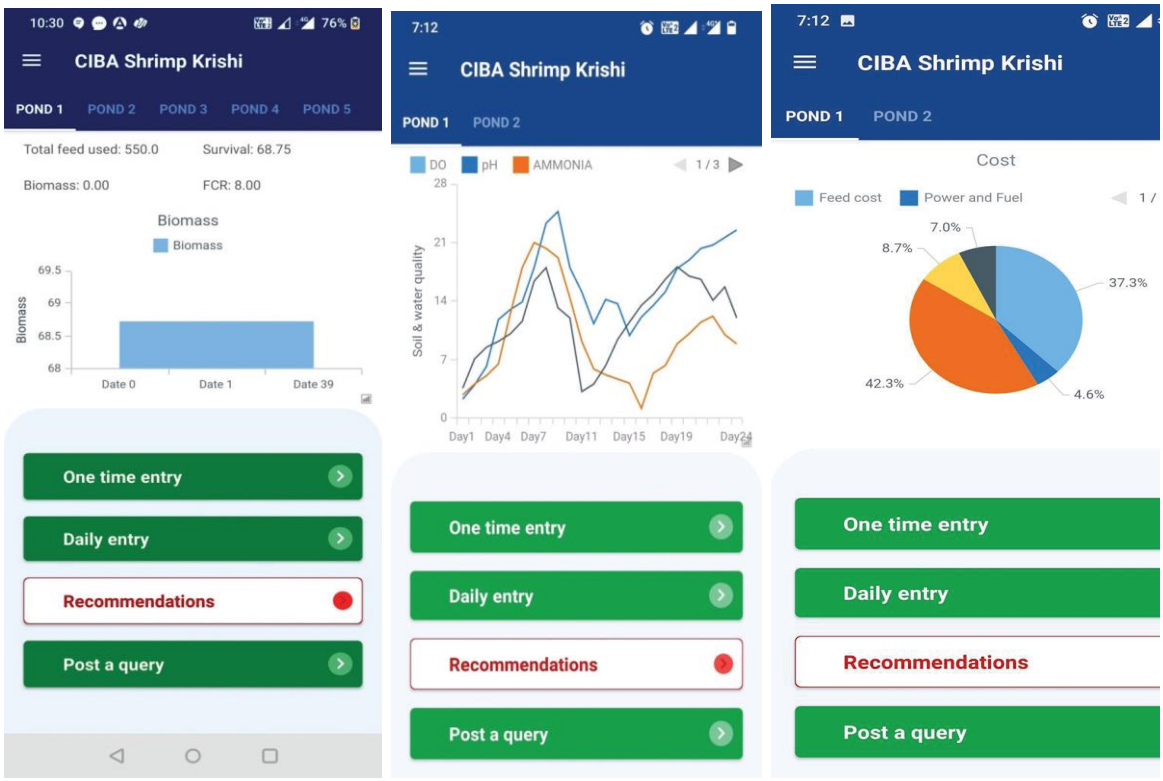

CIBA ShrimpKrishiApp আপনার খামার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্পূর্ণ সমাধান।

CIBA ShrimpKrishiApp: এখন আরও সহজ ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে

চিংড়ি চাষিদের চাহিদা মাথায় রেখে CIBA ShrimpKrishiApp এখন উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মেও উপলব্ধ।

- ল্যাপটপ থেকে ব্যবহার: চাষিরা এখন তাদের ল্যাপটপ ব্যবহার করে সহজেই অ্যাপটিতে তথ্য প্রদান করতে পারবেন।

- সিঙ্ক্রোনাইজেশন: অ্যান্ড্রয়েড এবং উইন্ডোজ - উভয় প্ল্যাটফর্মেই একই তথ্য দেখা যাবে। অর্থাৎ, আপনি যদি আপনার ফোনে তথ্য প্রদান করেন, তাহলে সেই তথ্য আপনার ল্যাপটপেও দেখা যাবে এবং তদ্বিপরীত।

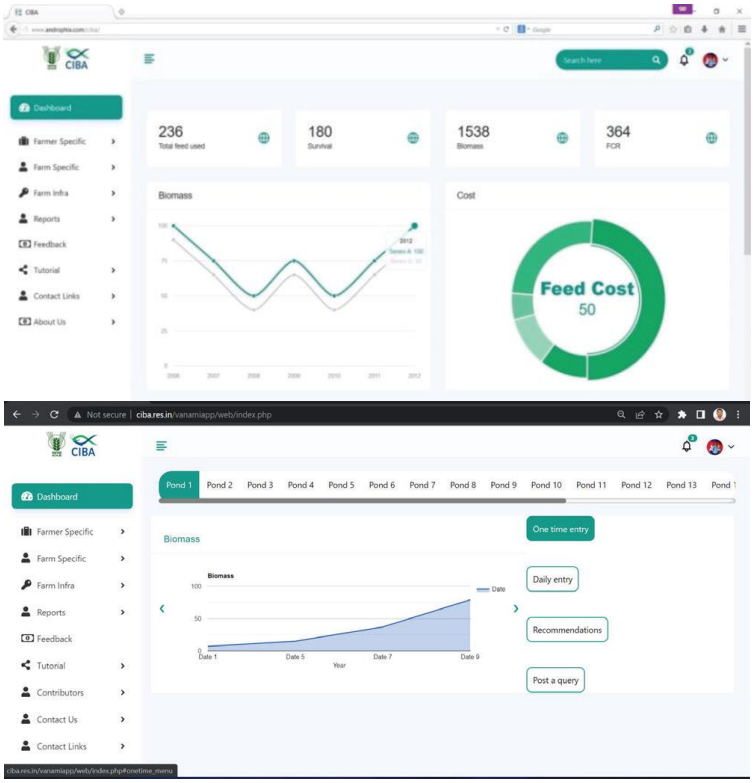

উপসংহার

CIBA ShrimpKrishiApp চিংড়ি চাষি এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার যা চিংড়ি চাষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে, চাষি এবং গবেষকদের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে নতুন নতুন তথ্য এবং প্রযুক্তি সহজেই চাষিদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং চাষিদের খুব সহজেই বিশেষজ্ঞদের কাছে পরামর্শ পেতে সাহায্য করে। CIBA ShrimpKrishiApp ভবিষ্যতে আরও উন্নত এবং সমৃদ্ধ হবে এবং চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাছ চাষ: রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে "রিপোর্ট ফিশ ডিজিজ"

মাছ চাষ দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে গেলেও, এই অগ্রযাত্রার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে নানান রোগ। বিদেশী বা অজানা রোগের হাত থেকে মাছেদের রক্ষা করতে এবং স্থানীয় রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রোগের প্রাথমিক লক্ষণ চিহ্নিতকরণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু রোগ প্রতিবেদন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই রোগ সম্পর্কে সঠিক সময়ে জানা সম্ভব হয় না।

সুতরাং, এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যা কৃষক, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কৃষক পর্যায়ে রোগ প্রতিবেদনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং দেশে মাছের রোগের প্রতিবেদন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য, আই সি এ আর-এন বি এফ জি আর (ICAR-NBFGR), লখনউ "রিপোর্ট ফিশ ডিজিজ" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে।

RFD অ্যাপের উপযোগিতা:

RFD অ্যাপ ব্যবহার করে এখন কৃষকরা তাদের খামারের মাছ এবং শামুক-ঝিনুকের যেকোনো রোগের খবর সরাসরি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং মৎস্য রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা খুব সহজেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেতে পারবেন এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এই অ্যাপ শুধু রোগের খবর জানানোর জন্যই নয়, এটি একটি তথ্য ভাণ্ডার হিসেবেও কাজ করবে। রোগ সম্পর্কিত তথ্য কোথায়, কখন এবং কতটা ছড়িয়ে পড়ছে তা এই অ্যাপের মাধ্যমে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

RFD অ্যাপের বৈশিষ্ট্য:

- অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য: গুগল প্লে স্টোর থেকে সহজেই ডাউনলোড করা যাবে।
- ওটিপি (OTP) ব্যবহার করে সাইন ইন: নিরাপত্তার জন্য ওটিপি ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খুলুন।
- পুকুরের স্বয়ংক্রিয় জিআই ট্যাগিং: আপনার পুকুরের অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ করা হবে।
- একাধিক ভাষায় উপলব্ধ: বর্তমানে ইংরেজি এবং হিন্দিতে উপলব্ধ। শীঘ্রই আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ হবে।
- ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস: সহজেই ব্যবহার করার জন্য সহজ ইন্টারফেস।
- তথ্য পূরণের সুবিধা: অধিকাংশ তথ্য চেকবক্স এর মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

- ছোট ফাইল সাইজ: অ্যাপটি ডাউনলোড করতে বেশি স্থান লাগবে না।
- তথ্য সুরক্ষা: আপনার সমস্ত তথ্য এনক্রিপ্ট করা থাকবে।
- পৃথক ফর্ম: মাছ, চিংড়ি এবং শামুক-ঝিনুকের রোগের জন্য পৃথক ফর্ম রয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ রোগ সম্পর্কে তথ্য: অ্যাপটিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোগ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।
- কার্যকর কার্যকারিতা জন্য বিভিন্ন স্তরের অ্যাডমিন: সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরের অ্যাডমিন থাকবে।
- গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ: মাছ চাষের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

"ReportFishDisease"
A Mobile Application for
Aquatic Animal Disease Reporting
Developed under
National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases
Funded under
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India
Coordinated by
ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources Lucknow, India
NATIONAL BUREAU OF FISH GENETIC RESOURCES

Rationale for Developing an Aquatic Animal Disease Reporting Mechanism

- Aquaculture sector is witnessing an impressive growth over the years
- However, the diseases are the most significant constraint to the growth of the aquaculture
- Early detection of diseases is important for eradication or containment of exotic or emerging diseases and management of endemic diseases
- Often in aquaculture go unreported due to unavailability of the field-level disease reporting mechanism
- Therefore, there is a necessity of a mechanism that can connect farmers, field-level officers and fish health experts for strengthening the farmer-based disease reporting
- Keeping the same in consideration, for improving the reporting of aquatic animal diseases in the country, a 'ReportFishDisease (RFD)' App has been developed by ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources (NBFGR), Lucknow

Proposed Mechanism of Disease Governance

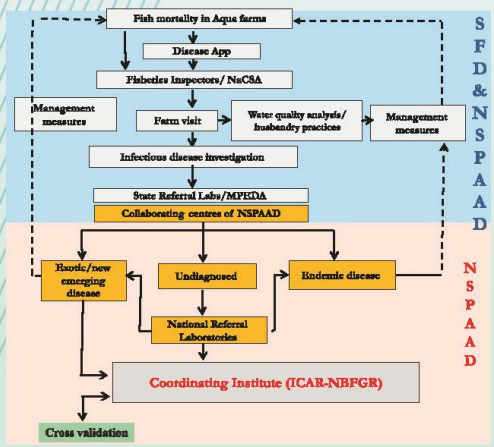

ReportFishDisease App

Usefulness of the App

- Using the RFD app, the farmers can report incidence of disease in finfish, shrimps and molluscs on their farms with the field level-officers and fish disease experts and get scientific advice.
- The data regarding the diseases will be stored on temporal and spatial scale and can be used for mapping the disease cases.

Features of ReportFishDisease App

- Android-based mobile app available on Google Play store
- Sign in using OTP
- Automatic getagging of the pond, hence data needs to be filled at pond site
- The app is currently available in English and Hindi, and will be available soon in regional languages
- User friendly interface – most of the details to be filled are given as check boxes
- The download size of the app is small
- Data protection is encrypted in the app
- Separate forms for reporting cases of diseases affecting Finfish, Shrimp and Mollusc
- Information about important diseases is provided in the App
- Different levels of 'Admin' for efficient functioning
- Provides a link to important National/International Organizations in fisheries sector

Panels of ReportFishDisease App

Farmer Dashboard

Admin Panel 1:
State Fisheries Department
Admin Panel 2:
NSPAAD Collaborating Center

Coordinating Institute Panel

Farmer Dashboard

Reporting a Disease Case

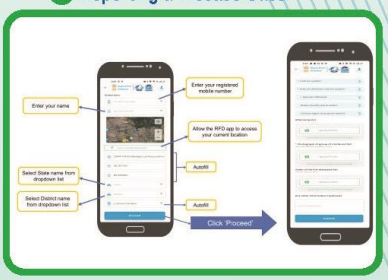

Disease Reporting Forms

Finfish

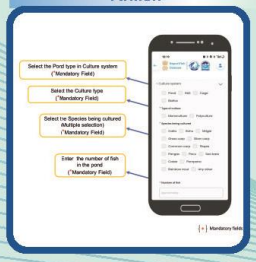

Shrimp

Mollusc

Tracking a Submitted case and Response Mechanism in the App

Following submission of disease report by the farmer, the same would go to the respective State Fisheries Department and NSPAAD Collaborating Centre who would investigate the case and suggest management measures. The Coordinating Institute would monitor all the disease cases reported by the farmers.

Admin Dashboards

Admin 1: State Fisheries Department	Admin 2: NSPAAD Colloborating Centre	Admin 3: Coordinating Institute

Epilogue

It is expected that the App would help in improving farmer-based reporting, getting scientific advice and reducing losses due to diseases, thereby increasing farmers' income.

কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৪৩৩৪৭